প্রেম যুদ্ধ
এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

# প্রেম যুদ্ধ

মূল

**এনায়েতুল্লাহ আলতামাস**

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
অনূদিত

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

প্রথম প্রকাশ ❑ সেপ্টেম্বর-২০১০

প্রেম যুদ্ধ ❑ এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাস

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১৯৯৩, কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মুদ্রণে ❑ বরাত প্রিন্টার্স
২২ ঋষি কেশ দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ নাজমুল হায়দার

মূল্য ❑ ১০০.০০ টাকা

ISBN-984-839-232-10

## আমার কথা

গল্প সত্য হয় নাকি? যত সত্য ঘটনাই হোক– সেটা গল্পে চলে আসলে তার অন্তর্নিহিত সত্যটা সব সময় অম্লান থাকে না; সেই সত্যের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটানোর কারণে আলো ফেলে। কিন্তু এমন গল্পও আছে নিরেট সত্য ছাড়া যার মধ্যে কাল্পনিক কোন সূত্র থাকে না। এখানকার ছয়টি গল্পও এমন নিরেট সত্যের দীপ্তিতে বর্ণিল।

এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের এ ধরনের গল্পের সঙ্গে আমাদের পাঠক সমাজ খুব একটা পরিচিত নয়। ইতিহাসের নির্বাচিত অংশ থেকে বিরল কিছু ঘটনা নিয়ে গল্পের আদলে এখানে আলতামাস উপসিস্থত হয়েছেন। পাঠক এ থেকে খণ্ডিত উপন্যাস বা 'লিটল ফিকশন'এর স্বাদও পাবেন। এর পরতে পরতে পাবেন চমক, ভিন্ন-ব্যতিক্রম স্বাদ, নাটকীয়তা, দুর্লভ ও মনে গেঁথে যাওয়া কিছু মুহূর্তের অনুরণন। আর দেখা পাবেন আত্মা জাগানিয়া অসাধারণ কিছু চরিত্রের।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

# উৎসর্গ

শের মোহাম্মদ
মানব হিতৈষী মহৎপ্রাণ একজন মানুষ
বিত্তবানদের মধ্যে এমন নিরহংকার
মার্জিত রুচির মানুষ খুব একটা দেখা যায় না
আলেমদের প্রতি এমন শ্রদ্ধাভাজন নিতান্ত ধার্মিক
লোকও আজকাল একান্তই বিরল

সূচীপত্রঃ

# ঈমানের ঝলক

১৮২৬ এর পহেলা ডিসেম্বর। সূর্যাস্ত হয়নি এখনো। তবে মোগল সালতানাতের অমিত তেজী সূর্য সেই কবে থেকে অস্তাচলের পথে যাত্রা শুরু করেছে। সালতানাতের রক্ষাকবচ হিসেবে যে কেল্লাগুলো মোগলীয় হস্তে নির্মিত হয়েছিলো সেগুলো এখন তাদের কবরগুলোর মতো উদাস–নীরব দর্শক হয়ে আছে। এর মধ্যে একটি কেল্লা হলো কেল্লায়ে লাহোর। যাকে বলা হয় শাহী কেল্লা। এই কেল্লা এখন শিখদের কব্জায় রয়েছে।

এই কেল্লার প্রধান অর্থাৎ কেল্লাদার উধাম শিং প্রতিদিনের মতো সান্ধ্য ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। সঙ্গে তার দুই মুহাফিজ। এক শিখকে এদিকে তখন দৌড়ে আসতে দেখা গেলো। মুহাফিজ দু'জন এগিয়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

'ব্যাপার কি? দৌড়ে আসছো কেন?'— মুহাফিজরা জিজ্ঞেস করলো।

'আমি কেল্লার কাসেদ'— শিখ বললো।

'আসতে দাও ওকে—উধাম শিং হুকুম দিলেন—'এদিকে এসো হে! কি হয়েছে বলো।'

'একজন মুসলমানকে পাকড়াও করা হয়েছে মহারাজ! কাসেদ এগিয়ে এসে বললো– 'সে নাকি ইসলামী ফৌজের কাসেদ। মহারাজার জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছে। আপনার এজাযত ছাড়া তো ওকে মহারাজার সামনে নেয়া যাবে না।'

'ইসলামী ফৌজ? উধাম শিং নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো—'কিসের ইসলামী ফৌজ? ... উহ ... এ মনে হয় পেশাওয়ারের পাঠান খান্দানের কাসেদ। দাম্ভিক কণ্ঠে বললেন এবার। 'এ ধরনের কাসেদকে গ্রেফতার করার কি প্রয়োজন ছিলো? সন্ধির প্রস্তাব মনে হয় সে নিয়ে এসেছে। এমন কমজোর লোকদের কাসেদকে ভয় কিসের? ... যাও আমি আসছি। ওকেও নিয়ে এসো।'

কেল্লার এক জায়গায় কমপক্ষে বিশ বাইশজন শিখ খোলা তলোয়ার নিয়ে এক মুসলিম যুবককে ঘিরে রেখেছে। কেল্লার প্রধান উধাম শিংকে দেখে তারা

ঘেরাও হালকা করে দিলো। উধাম শিং দেখলেন, বিশ বাইশ বছরের গৌর বর্ণের সুদর্শন এক যুবক তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার তলোয়ারটি তার কোষাবদ্ধ রয়েছে। উধাম শিং এর চেহারা থমথমে হয়ে উঠলো। তিনি সহকারী কেল্লাদার কাহেন শিং এর দিকে রাগত চোখে তাকালেন।

'মহারাজ! কাহেন শিং কেল্লাদারের রাগত দৃষ্টির প্রশ্ন বুঝতে পেরে বললো— 'এ মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। কিন্তু ওর তলোয়ার আমাদের কাছে হাওলা করছে না।'

'কি নাম তোমার? উধাম শিং আগত যুবককে জিজ্ঞেস করলো– 'কোত্থেকে এসেছো?'

'আমার নাম হিম্মত খান। আমি আমাদের সালারে আলা সায়্যিদ আহমদের পয়গাম এনেছি মহারাজ রঞ্জিৎ শিং-এর নামে।'

'উহ! সায়্যিদ আহমদ! উধাম শিং ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য করে বললেন– সেকি দু'চারজন লোক জমিয়ে সালারে আলা বনে গেছে?

'তিনি যাই হোক, আমি মহারাজ রঞ্জিৎ শিং-এর নামে উনার পয়গাম এনেছি'– হিম্মত খান তার আশপাশের শিখদের বেষ্টনীর দিকে তাকিয়ে বললো— আপনাদের অতি নগণ্য লোকও যদি আমাদের ওখানে যায় আমরা তার সঙ্গে এ ধরনের অভদ্র আচরণ করবো না যেমন আমার সঙ্গে করা হচ্ছে।'

'এটা একটি কেল্লা নওজোয়ান! আমাদের কিছু নিয়ম কানুন আছে তোমাকে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো। তবে তোমার তলোয়ার আমাদের কাছে হাওলা করতে হবে।'

'নিয়ম কানুন কিছু আমাদেরও আছে'— হিম্মত খান বললো—'আমাদের ধর্মে দুশমনের কাছে হাতিয়ার হাওলা করাটা পাপ মনে করা হয়। আমি আপনাদের মহারাজাকে হত্যা করতে আসিনি। তাকে একটি পয়গাম দিতে এসেছি।'

'কিসের পয়গাম? বন্ধুত্বের? মুসলমানরা এখন বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না।'

'এর মীমাংসা মহারাজ রঞ্জিৎ সিং-এর জবাবের পর করা হবে। তবে অতিরিক্ত কথা বলার অনুমতি নেই আমার। আমার কাজ শুধু পয়গাম শুনিয়ে দেয়া।'

'তুমি আজ রাতে আমাদের মেহমান– উধাম শিং-এর গলায় এখন মার্জনার ছোঁয়া– 'আগামীকাল তোমায় মহারাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে– তিনি কাহেন

শিংকে বললেন– ওকে মেহমানখানায় পৌছে দাও। লক্ষ রাখবে, ওর যেন কোন অসম্মান না হয়। ওর তলোয়ারও থাকবে ওর কাছে।'

উধাম শিং হিম্মত খানকে মেহমানখানায় পাঠিয়ে রঞ্জিৎ শিং-এর কাছে চলে গেলেন। রঞ্জিৎ শিং-এর অবস্থা তখন কোন গুরু গম্ভীর বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার মতো ছিলো না। তার সামনে ছিলো মদের বড় সুরাহী। কয়েজন তোষামোদে দরবারীকে নিয়ে তিনি মদের মধ্যে ডুবে ছিলেন। উধাম শিংকে দেখে দুহাত প্রসারিত করে বললেন— আরে আমাদের কেল্লাদারও এসে গেছে।'

'মহারাজ ঃ উধাম শিং রঞ্জিৎ শিংকে বললেন— 'এই সায়্যিদ আহমদ কি সেই লোক যার কথা আপনি সেদিন বলেছিলেন? আপনি বলেছিলেন সায়্যিদ আহমদ হিন্দুস্থানের লোক। এখন কান্দাহার থেকে পেশাওয়ার এসেছে। আপনি বলেছিলেন, সে কোন আলেম যালেম কিছুই না। একজন জাদুকর মাত্র। যেখানেই যায় সেখানকার মুসলমান তার হাতে বায়আত হয়ে যায় এবং তার ফৌজে শামিল হয়।'

'একথা বলার এখনই তোমার সময় হলো উধাম শিং?' রঞ্জিৎ শিং কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন— 'তুমি তো কোন নতুন কথা শোননি? সায়্যিদ আহমদকে তো আমরা এমন কিছু মনে করি না যে এমন মূল্যবান সময়ে তার আলোচনা নিয়ে বসে থাকবো।'

'নতুন কথা এই যে মহারাজ! উধাম শিং জরুরী গলায় বললেন– 'তার এক কাসেদ কোন পয়গাম নিয়ে এসেছে। কাসেদ বলছে, সে তার তলোয়ার নিয়ে আপনার কাছে আসবে।'

'তুমি এক মুসলমানের সামান্য একটি তলোয়ারকে ভয় পাচ্ছো? কাল সকালে তাকে দরবারে পেশ করো। ওর কাছ থেকে থেকে তলোয়ার নেয়ার দরকার নেই ... আর উধাম শিং! সায়্যিদ আহমদকে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যেমন তুমি মনে করছো।'

উধাম শিং গম্ভীর মুখে সেখান থেকে চলে এলেন। মহারাজা রঞ্জিৎ শিং-এর মদের রঙ্গীন আসর তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারলো না। তিনি মেহমানখানায় চলে এলেন। হিম্মত খানের কামরায় গিয়ে দেখলেন, হিম্মত খান নামায পড়ছে। উধাম শিং নিস্পলক সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হিম্মত খান

নামায শেষ করে সংক্ষেপে দু'আ করলো। তারপর জায়নামায থেকে উঠে দাঁড়ালো।

পেছনে উধাম শিংকে দেখে চমকে উঠলো। কখন উধাম শিং এসেছেন সেটা সে টের পায়নি। উধাম শিং হিম্মত খানের খাটের ওপর বসে পড়লেন।

'আমি তোমাদের সালারে আলা সায়্যিদ আহমদ সম্পর্কে জানতে চাই'। উধাম শিং বললেন— 'আমি তার সম্পর্কে সামান্যই শুনেছি।'

'আপনার এ আশা করা উচিত হবে না যে, যা বলা উচিত নয় তা আমি আপনাকে বলে দেবো'– হিম্মত খান বললো কিছুটা শক্ত কণ্ঠে– 'আপনি আমাকে ইযযত করেছেন ঠিক, কিন্তু এজন্য আপনাকে আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারি না। আপনাকে আমি এটা বলতে পারবো না যে, আমাদের সৈন্যসংখ্যা কত? আমাদের অস্ত্র কি কিংবা আমাদের লড়াইয়ের কৌশলই বা কি? শুধু ব্যক্তি সায়্যিদ আহমদ সম্পর্কে আপনাকে আমি বলতে পারবো। তিনি কে? এবং কি তার মিশন।'

'আমি এটাই জানতে চাই'– উধাম শিং সামান্য হেসে বললেন।

'আমার কথা হয়তো আপনার কাছে ভালো লাগবে না— হিম্মত খান বলে গেলো— 'এটা মাযহাব আর ধর্মের ব্যাপার। প্রত্যেকেই তার ধর্মকে সত্য বলে মনে করে। তারপরও আপনি যা জানতে চান তা আমি সংক্ষেপে বলছি ...

'উনার নাম সায়্যিদ আহমদ। হিন্দুস্তানের বেরলভী শহরের লোক। আল্লাহ তাআলা তাকে অন্তরলোকের আলো দান করেছেন। দিয়েছেন এক মঞ্জিলের রাহনুমা। যা হক ও সত্যের মঞ্জিল। সায়্যিদ আহমদ অনেক বড় বিদ্বান-আলেম। কিন্তু তিনি কামরায় বসে আল্লাহ আল্লাহ করা আর মিম্বারে উঠে ওয়াজ নসীহতকারী আলেম নয়। তিনি আল্লাহর পথে সংগ্রামের শিক্ষা দেন। মুসলমানের জন্য আল্লাহর পথে সংগ্রাম অন্যতম এক ইবাদত... ।'

'হিন্দুস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু মুসলিম রাজা বাদশাহরা যখন আল্লাহর পথ থেকে সরে গেছে তখন তো দেখেছেনই ইসলামী ঝাণ্ডাও মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর সমুদ্রের ওপার থেকে ফিরিঙ্গিরা এসে এদেশ দখল করেছে। সায়্যিদ আহমদ আমাদের সবক দিয়েছেন যে, কুরআনের শিক্ষা মতে মুসলমান কারো গোলাম হতে পারে না। কারণ, গোলামি মানুষের ভেতরের সব কল্যাণবোধও স্বকীয়তাবোধ নষ্ট করে দেয়। সায়্যিদ আহমদ তাই হিন্দুস্তানে আল্লাহর হুকুম কায়েম করতে চান। গোলামি করতে হলে একমাত্র আল্লাহর গোলামি করতে হবে। কোন মানুষের গোলামি করা যাবে না ...

'বর্তমানে দেশের যে অবস্থা তাতে লড়াই আর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। এজন্যই তিনি জিহাদের শিক্ষা দেন। কাফেরদেরকে প্রথমে তিনি সত্যের পথে দাওয়াত দেন। তিনি বলেন, মানুষের ওপর মানুষের আইন চলবে না, চলবে আল্লাহর আইন। কুরআনে যা আছে তাই বলেন আমাদের সালারে আলা। তিনি গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর ঘুরে এসেছেন। সর্বপ্রথম তিনি পথহারা মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন। তিনি বলেন, কুফুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক বড় ইবাদত। আর আল্লাহর পথে তলোয়ার চালনা আর তীরন্দাযী ছাড়া দীনী ইলম– ইসলামের শিক্ষা পূর্ণ হতে পারে না।'...

'তিনি যে দিকেই যান সেখানকার মুসলমানরা তার শিষ্য বনে যান। তার বলার সুরে এমন এক তন্ময়তা আছে যে, কোন মুসলমান তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। তার আওয়াজে যেন আল্লাহর গায়েবী আওয়াজ আছে। অসংখ্য বিধর্মীও তার হাতে বায়আত হয়েছে এবং মুসলমান হয়ে গেছে ... ।'

'আমি খুব শিক্ষিত ছেলে নই। অতি সাধারণ এক লোক। আমি তাঁর মতো বলতে ও পারবো না এবং আমার ভাষায় আপনি সেই মুগ্ধকর স্বাদও পাবেন না। আপনি কখনো তার কথা শুনলে অজান্তেই বলে উঠবেন। এটা মানুষ নয় খোদাপাক যেন বলছেন। তখন আপনিও আমার মতো তীর বৃষ্টি আর দুশমনের তলোয়ারের ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে নামায পড়তে পারবেন। যদি জিজ্ঞেস করেন আমাদের লড়াইয়ের কৌশল কি? এর জবাবে আমি শুধু এতটুকু বলবো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে লড়াই করি।'

শিখেরা সুসংগঠিত কোন জাতি ছিলো না। গোত্র আকারে এরা অস্তিত্বমান হয়। যাদের ইতিহাসে শাসন-ক্ষমতা আর লড়াই-যুদ্ধের নাম নিশানাও ছিলো না। এজন্য রণাঙ্গনের ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিলো না। তবে ব্যক্তিগতভাবে এরা লড়তে জানতো। কারণ, তাদের পেশা ছিলো ডাকাতি আর রাহাজানি। দলবদ্ধ হয়ে এরা ছিনতাই রাহাজানি করতো।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর হিন্দুস্তানের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে উঠে।

ইংরেজরা পুরো ভারতবর্ষ গ্রাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় কোন শাসন ক্ষমতা ছিলো না। নৈরাজ্য আর বিশৃংখলাই ছিলো আসল হুকুমত। এই নৈরাজ্যজনক অবস্থা থেকে ফায়দা উঠায় শিখেরা। তারা পাঞ্জাব দখল করে নেয়। এদের রাজত্বের সময়সীমা ছিলো চল্লিশ বছরের। তবে এর মধ্যে তারা

যুদ্ধ বিগ্রহহীন নিরাপদ সময় খুব একটা উপভোগ করতে পারেনি। ইংরেজ কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে তাদের লড়াই লেগেই থাকতো। এমনকি হিন্দুদের সঙ্গেও তাদের লড়াই হয়।

মুসলমানদেরকে এ সময় হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) 'তাহরীকে মুজাহিদীন'-এর প্লাটফর্মে সমবেত করার চেষ্টা করেন।

শিখদের মধ্যে যদিও বোধ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা কম ছিলো এবং উগ্রতা আর অবাধ্যতাই ছিলো বেশি; কিন্তু লাহোরের কেল্লাদার উধাম শিং রাশভারী লোক ছিলেন। তিনি ভাবনা চিন্তা করতে জানতেন। তিনি কাসেদের কাছ থেকে সায়্যিদ আহমদের চেতনা-দর্শন শুনে অন্যদের মতো ঠাট্টা বা বিদ্রুপ করলেন না। নীরবে মেহমানখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার আনত মাথা ও চলার ভঙ্গি বলে দিচ্ছিলো, তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন।

পরদিন সকালে মহারাজ রঞ্জিৎশিং তার শাহী সিংহাসনে বসেছিলেন। এ সিংহাসন ছিলো কোন মুসলমান বাদশাহর স্মৃতিখণ্ড। রঞ্জিৎশিং-এর চেহারা ফেরআউনি দম্ভে ফেটে পড়ছিলো। তার সামনে বসা ছিলো দরবারীরা। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো দুই মুহাফিজ। এক পাশে তার মহারানী। সবাই কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলো। কারণ, মহারাজাকে দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি কোন ব্যাপারে বেশ ক্ষুব্ধ। কুচকুচে চোখে তিনি দরজার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন। যেন কারো অপেক্ষায় আছেন।

এসময় হিম্মত খান দরবারে প্রবেশ করলো। তার ডানে বামে বর্শা উচিয়ে দুই শিখও প্রবেশ করলো। হিম্মত খান রঞ্জিৎ শিং-এর সামনে গিয়ে দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'আসসালামু আলাইকুম'।

মহারাজা মাথা ঝটকা দিয়ে দরবারী ও মুহাফিজদের ওপর চোখ ঘুরিয়ে গর্জে উঠলেন—

'ওকে কি কেউ বলেনি যে, এটা মহারাজা রঞ্জিৎ শিং-এর দরবার। এখানে ঝুঁকে পড়ে সালাম করতে হয়?'

'মহারাজা! হিম্মত খান সোজা কণ্ঠে বললো— 'কেউ আমাকে বললেও আমি ঝুঁকে সালাম করতাম না। আমি এই পয়গাম নিয়েই এসেছি যে, কোন মানুষের এতটুকু অধিকার নেই যে, সে অন্য কোন মানুষকে তার সামনে ঝুঁকতে বাধ্য করবে। আল্লাহর বান্দা শুধু আল্লাহর সামনেই মাথা ঝোঁকায়'।

'সায়্যিদ আহমদের যে পয়গাম তুমি নিয়ে এসেছো সেটা শুনে তোমার ভাগ্যের ফয়সালা করবো– রঞ্জিৎ শিং বললেন— তোমাকে যে এখানে পাঠায়েছে সে কি বলেনি যে, রঞ্জিৎ শিং-এর নাম শুনে ইংরেজ ও পাঠানরাও কেঁপে উঠে! তোমার বয়স তো কম। এজন্য যৌবনের আবেগ তোমাকে মূর্খ করে দিয়েছে– তিনি ধমকে উঠলেন— শুনাও তোমার পয়গাম'।

হিম্মত খান ভাঁজ করা একটা কাগজ খুললো এবং উঁচু আওয়াজে পড়তে শুরু করলো—

'আল্লাহর নগণ্য বান্দা সায়্যিদ আহমদের পয়গাম, পাঞ্জাবের হাকিম মহারাজা রঞ্জিৎ শিং-এর নামে—

'আমি আপনার সামনে তিনটা দিক পেশ করছি। প্রথম হলো– ইসলাম কবুল করে নিন। সেক্ষেত্রে আমরা পরস্পর ভাই ভাই বনে যাবো। তবে এতে জোরজবরদস্তির কিছুই নেই। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম গ্রহণ না করলে আমাদের আনুগত্য গ্রহণ করে নাও এবং জিযিয়া প্রদান করতে থাকো। সে ক্ষেত্রে আমরা যেমন আমাদের জান মালের হেফাজত করি তোমাদের জান মালেরও সেভাবে হেফাজত করবো।

তৃতীয়ত ঃ ওপরের দুটি প্রস্তাব মেনে না নিলে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। আর শুনে রাখো, পুরো ইয়াগিস্তান ও হিন্দুস্তানের প্রতিটি মুসলমান আমাদের সঙ্গে আছে। আর শহীদ হওয়া আমাদের কাছে যতটা প্রিয়, রক্তে স্নাত হওয়া আমাদের কাছে যতটা আকর্ষণীয়; তোমাদের কাছে শরাব আর রূপবতী নারীও এতটা প্রিয় নয়' ...

সায়্যিদ আহমদ<br>সালারে আলা<br>লশকরে মুহাজিদীন

মহারাজা রঞ্জিৎ শিং যেন আগুনের অঙ্গার হয়ে উঠলেন। মুহাফিজদের হাত চলে গেলো কোমরে বাঁধা তলোয়ারের ওপর। দরবারীরা দাঁড়িয়ে গেলো চরম উত্তেজিত হয়ে। হিম্মতখানের মুখে তার স্বভাবজাত হাসিটি ঝুলে রইলো। দরবারীদের নীরব হম্বি তম্বি তার গায়ে সামান্য আচরও কাটতে পারলো না। রঞ্জিৎ শিং দেখলেন, দরবারীদের চেহারা থমথম করছে। সবার হাত তলোয়ারের ওপর শক্ত হয়ে আছে। শুধু একজন শিখ-এর ব্যতিক্রম। যার চেহারা ছিলো

ভাবলেশহীন। তিনি এমনভাবে বসেছিলেন যেন এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি হলেন কেল্লাদার উধাম শিং।

'এই ছেলে অনেক দূর থেকে এসেছে— রঞ্জিৎ শিং কর্কশ গলায় বললেন– 'এজন্য আমি ওর মার প্রতি রহম করছি। তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেয়া হবে। তবে তার মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ কামিয়ে তাকে লাহোর থেকে বের করে দাও।'

কাহেন শিং সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে হিম্মতখানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোষ থেকে তলোয়ারটি ছিনিয়ে নিলো। পাঁচ ছয়জন মুহাফিজ হিম্মতখানকে ঘেরাও করে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দরবার থেকে বের করে নিয়ে গেলো।

'সায়্যিদ আহমদ'! রঞ্জিৎ শিং বিদ্রুপ করে বললেন— 'আহ ... হাহ্! সায়্যিদ আহমদ, ... এই জাযাবর মুসলমানরা বরবাদ হয়ে গেলো। কিন্তু এখনো তাদের মাথা থেকে হিন্দুস্তানের বাদশাহীর ভূত নামলো না। মোল্লাদের মতো 'ওয়াজ করনেওয়ালা' সায়্যিদ আহমদ শিখ রাজাদের সঙ্গে লড়তে এসেছে। ওকে কেউ কি বলেনি যে, এখন রাজত্ব করবে শুধু শিখ রাজারা?'

'মহারাজা! উধাম শিং গম্ভীর গলায় বললেন— 'না দেখে যাচাই না করে দুশমনকে দুর্বল মনে করা ঠিক নয়। কাসেদ এসেছে 'নও শহরা' থেকে। এর অর্থ হলো, মুসলমান লশকর 'নও শহরা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সায়্যিদ আহমদ সম্ভবত ঠিকই লিখেছেন যে, পুরো ইয়াগিস্তান তার সঙ্গে আছে ...

'আমি এও জানতে পেরেছি, হিন্দুস্তান ও পাঞ্জাবের মুসলমানরাও 'নও শহরা' ও পেশোয়ার যাচ্ছে। সায়্যিদ আহমদ তাদের মধ্যে নতুন কোন প্রাণের সঞ্চার করেছেন যেন। ওখানে গিয়ে আমাদের অবরোধের মতো অবস্থান নেয়া উচিত। না হয় শিখ রাজ্য বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। আর আমাদের উচিত মুসলমানদেরকে আকোড়া ও নও শহরার পাহাড়ে লড়ানো। যদি ওরা লাহোরের ময়দানে আসার সুযোগ পায়, লড়াই তাদের জন্য সহজ হয়ে উঠবে এবং আমাদের জন্য ওরা কঠিন প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে। যা করার এখনই করতে হবে।'

'বুধ শিং এখন কোথায় আছে'? রঞ্জিৎ শিং জিজ্ঞেস করলেন– 'তার সঙ্গের সৈন্য সংখ্যা কত?'

'তিনি নদীর এপারে– দেওয়ান উঠে জবাব দিলো– 'তার সঙ্গে আছে সাত হাজার সৈন্য।'

'যথেষ্ট। উন্নত জাতের ঘোড়ায় করে এখনই কাসেদ পাঠিয়ে দাও। সে যাতে বুধ শিংকে এই পয়গাম দেয় যে, এখনই আকোড়া পৌঁছে যাও এবং সুবিধাজনক কোথাও ছাওনি ফেলো। তবে সৈন্যদের সব সময় প্রস্তুত রাখতে হবে। সেখানে আমাদের ওফাদার কোন মুসলমানকে পাঠিয়ে জেনে নিতে হবে সায়্যিদ আহমদের সৈন্যসংখ্যা কত? হামলার ব্যাপারে বুধ শিং নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে এবং সায়্যিদ আহমদকে তার লশকরসহ খতম করে দেবে।'

কাহেন শিং হিম্মত খানকে নিয়ে যাচ্ছিলো। সঙ্গে আছে আরো দু'তিনজন সিপাহী। হিম্মতখান এখন নিরস্ত্র। হিম্মতখানের ওপর রাগে জ্বলে যাচ্ছিলো কাহেন শিং। কারণ, প্রথমে কেল্লায় প্রবেশের সময় তাকে বলার পরও তার তলোয়ার কাহেন শিং-এর কাছে হাওলা করেনি।

সে এক সিপাহীকে হুকুম দিলো, ওকে বড় ফটকের দিকে নিয়ে যাও। আর আরেকজন গিয়ে নাপিতকে নিয়ে এসো।

এসব কথায় হিম্মত খানের কোন ভাবান্তর হলো না। নির্বিকার-নিস্পৃহ মুখে শিখদের বেষ্টনীতে হাটছিলো হিম্মত খান। কাহেন শিংয়ের হয়রানির শেষ ছিল না, হিম্মত খান কেন তার কাছে অনুনয়, বিনয় করছে না যে, তার চুল দাড়ি যেন না ফেলা হয়।

আরে এ দেখি মিটি মিটি হাসছেও। বেটা তো দেখি মহা শয়তান!

'আরে ঐ মুসলে (মুসলমানের বাচ্চা)'! কাহেন শিং হিম্মতখানের পেটে খোঁচা দিয়ে বললো— 'মহারাজার কাছে মাফ চাইলি না কেন? আমার পায়ে পড়ে যা। তোকে মাফ করে কেল্লার বাইরে সসম্মানে পাঠিয়ে দেবো।'

হিম্মত খান হেসে বললো— 'আল্লাহর পথে আমাদের হাত পা কেটে গেলেও আফসোস করি না আমরা। আর আমার মাথার তুচ্ছ চুলের জন্য তোমার মতো এক গর্দভের কাছে মাফ চাইবো!'

কাহেন শিং পেরেশান হয়ে গেলো। খুব কষ্ট করে নিজের হাত সংযত রাখলো। এই মুসলের যে সাহস। তারপর আবার দূত হয়ে এসেছে। একে কিছুই বলা যাচ্ছে না। রাখ শালা, নাপিত এনে নাপিতকে বলে দেবো। তোর মাথার চুল কাটার সময় যেন মাথাটা আঁচড়ে দেয়। এসব সে মনে মনে বললো, মুখে কিছুই বললো না।

কাহেন শিং ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং এক সিপাহীকে নাপিত ডেকে আনার জন্য পাঠিয়ে দিলো। কেল্লার ফটক খুললো। ভেতরে দু'জন সওয়ারী এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। আর ঘোড়া দুটি ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে কিছু জিজ্ঞেস করতে প্রহরীর দিকে এগিয়ে গেলো। ফটক খোলাই রইলো। কারণ, বাহির থেকে দুটি গরুর গাড়ি ভেতরের দিকে আসছিলো।

কাহেন শিং গরুর গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলো। হিম্মত খান দেখলো, কাহেন শিং-এর মনোযোগ এখন অন্য দিকে। এই সুযোগ। মুহূর্তেরও কম সময়ে কাহেন শিং-এর চোয়ালে ও পেটে দুটি দশাসই ঘুসি পড়লো।

'ওরে বাবারে' বলে কাহেন শিং চিত হয়ে পড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গেই, আর হিম্মত খান তখন উঠে গিয়ে একটি ঘোড়ায় গিয়ে চড়লো এবং সজোরে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলো। ঘোড়া এক লাফে ফটক পেরিয়ে ছুটতে শুরু করলো উর্ধ্বশ্বাসে।

কাহেন শিং হাউমাউ করে উঠলো, কে কোথায় আছিসরে! ঐ সিপাহীরা! ঐ মুসলমানের বাচ্চা পালালো যে! সিপাহীরা দৌড়ে এসে এই দৃশ্য দেখে দ্বিধায় পড়ে গেলো, কাহেন শিং-এর এমন মজাদার তামাশা দেখবে, না ঘোড়ায় চড়ে মুসলমানের পিছু নেবে। কাহেন শিং-এর রক্ত চক্ষু দেখে তাড়াতাড়ি দুই সিপাহী ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিন্তু হিম্মত খান ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

হিম্মতখান ঘোড়া ছুটাচ্ছিলো ঠিক; কিন্তু সে নিরাপদ ছিলো না। একে তো সে নিরস্ত্র ছিলো। দ্বিতীয়ত শিখদের কাছে দূর পাল্লার রাইফেল ছিলো। তার পিছু ধাওয়াকারীরা তাকে গুলি করে ফেলে দিতে পারে। যদিও সাধারণ সিপাহীদের কাছে তখন রাইফেল দেয়া হতো কম, তাই সে নিয়মিত রাস্তা থেকে সরে জঙ্গলের পথে ছুটতে লাগলো। 'রাবী' পর্যন্ত পুরো এলাকাটাই ঘন জঙ্গলে ছাওয়া ছিলো তখন।

শীতের মৌসুম হওয়াতে যেখানে নদীর প্রান্ত চওড়া সেখানে পানির গভীরতা অনেক কম। হিম্মত খান দক্ষিণ দিক ঘুরে গিয়ে ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো। পানি ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্তও পৌঁছছিলো না। নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে আবার উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটালো। তার সামনে এখন বড় লম্বা সফর।

❖❖❖❖❖

অটাক থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত পুরো এলাকায় ছিলো শিখদের শাসন ক্ষমতা। আসলে এ ছিলো জুলুম, অত্যাচার আর লুটপাটের রাজত্ব। শিখেরা তাদের এলাকাগুলো ত্যাগ করে ঠিকাদারির ভিত্তিতে কিছু বদ লোকদের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলো। ঠিকাদাররা গরীব প্রজাদের কাছ থেকে অর্থকরি নিয়ে ফসল ফলাদিরও খাযনা আদায় করতো আর শিখদের ধনভাণ্ডার ভরে তুলতো। জায়গায় জায়গায় শিখ ফৌজ মোতায়েন থাকতো।

যেখানেই প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করতো শিখ ফৌজ তাদের ওপর টুটে পড়তো। কোন মুসলমানই সেখানে নিরাপদে থাকতে পারতো না। মুসলিম মেয়েদের আবরু ইজ্জত শিখদের কাছে যিম্মি হয়ে পড়েছিলো। মুরগির খোয়াড়ের মতো মেয়েদের ঘরের ভেতর ভরে রাখতে হতো। শিখ ফৌজের ঘোড়ার দানা পানির রহস্যও প্রজাদের ফসলি যমিন কেটে নিয়ে যাওয়া হতো। এজন্য লোকেরা আনাজ-তরকারি বাড়ির পেছনে গর্ত খুড়ে তাতে লুকিয়ে রাখতো।

পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা পোষণ ও ক্ষমতার লড়াই ইত্যাদি কারণে মুসলমানরা শিখ ও পাঠানদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছিলো। এমনকি চারদিক থেকে কোণঠাসা হওয়ার পরও তারা ঐক্যের পথে অগ্রসর হয়নি। বরং একে অপরের ওপর ক্ষমতাবল প্রয়োগের জন্য শিখদের পা চাটা শুরু করে দিলো। শিখদের জন্য এছিলো না চাইতেই হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। তারা পাঠান মুসলমানদের মধ্যে চোরা বিশ্বাস ঘাতক আর গাদ্দার তৈরী করতে পারলো খুব সহজে।

শত্রুতা আর চাটুকারিতার প্রতিযোগিতা ছিলো সরদার ও নেতৃস্থানীয়দের কাজ। কিন্তু এর শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছিলো সাধারণ লোকদের। পাঠান মুসলমানরা শিখদেরকে নিজেদের শাসক হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না কোন ক্রমেই। কিন্তু ঐক্য ও সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া জুলুম অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না।

এ অবস্থায় সে এলাকায় এলেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ। তিনি দেখলেন, দুশমনের অনবরত জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে লোকজন নিজেদের পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন আর জাযাবরের জীবন যাপন করছে। লোকদেরকে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে ঐক্যের পথে আসার দাওয়াত

দিলেন। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলো। মসজিদ থেকে আবার কালেমা ও আযানে সুর মাধুরী ভেসে আসতে লাগলো।

হিম্মত খান যখন নওশহরা পৌঁছলো তখন তার অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়। তার চেহারা মরা লাশের মতো ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করেছিলো। তাকে তখনই সায়্যিদ আহমদ শহীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। হিম্মত খান হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণ কণ্ঠে জানালো রঞ্জিৎ শিং তার পয়গামের সঙ্গে ও তার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন। সায়্যিদ আহমদ আগে হিম্মত খানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ফৌজকে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হওয়ার হুকুম দিলেন।

সেদিনই অটাকে বুধ শিং-এর ছাউনিতে লাহোর থেকে এক কাসেদ পৌঁছলো। পয়গামে বুধ শিংকে মহারাজা রঞ্জিৎ শিং হুকুম দিয়েছেন যে, সায়্যিদ আহমদ ও তার দলবলকে কোন সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুর ঘাটিতে পৌঁছে দাও। আর যদি ওরা ফৌজের মতো প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে হামলা করে খতম করে দাও ওদের।

অবশ্য এর আগে বুধ শিংও লাহোরে রঞ্জিৎ শিং-এর কাছে এক পয়গাম পাঠায়। লাহোরের কাসেদ বুধ শিং-এর কাছে পৌঁছার পরই বুধ শিং-এর কাসেদ লাহোরে রঞ্জিৎ শিং এর দরবারে পৌঁছে যায়।

পয়গামে লেখা ছিলো, 'সায়্যিদ আহমদ তার বাহিনী নিয়ে নওশহরা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমাদের ওয়াফাদার মুসলমান সরদাররা তার ব্যাপারে আমাকে যে খবর দিয়েছে এতে আমরা তাকে সাধারণ লোক বলে মনে করতে পারি না। আবার তাকে বড় কোন দরবেশ বা সুফীও বলতে পারবো না। আমাকে বলা হয়েছে, তিনি খুব যুদ্ধবাজ লোক, কাবুল কান্দাহার ও আশপাশের এলাকায় তিনি তার যুদ্ধ-নৈপুণ্যের চমৎকার ঝলক দেখিয়েছেন। গুপ্তচররা আমাকে জানিয়েছে, সায়্যিদ আহমদ আপনার দরবারে এক পয়গাম পাঠিয়েছে। যদি আপনি সে পয়গাম গ্রহণ করেন তাহলে তা শিখ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কাসেদকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে মুসলমানরা সায়্যিদ আহমদের ঝাণ্ডা উচিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে বসবে। পাঠানরাও সেই ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হচ্ছে।'

বুধ শিং পয়গামে জানালো, আঁকোড়ার রঈস আমীরখান আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। কিন্তু তার ভাই ফায়রুজখানের ছেলে খাসখান আবার আমীর খানের

বিরোধী। তিনি আমাকে আকোড়া ডাকিয়েছেন। তিনি চাচ্ছেন– আমি আমার সেনাবাহিনী নিয়ে যেন আকোড়ার কাছে ছাউনি ফেলি এবং তার চাচা আমীর খান ও সায়্যিদ আহমদকে সেখানেই খতম করে দেই। এজন্য মহারাজার কাছে আমার আবেদন, অতি সত্বর যেন লাহোর থেকে সেনা সাহায্য পাঠানো হয়। কারণ, সায়্যিদ আহমদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় যদি আমাদের ওয়াফাদার কোন পাঠান সরদার মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলায় তাহলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাবো। তখন অতিরিক্ত সৈন্য না থাকলে আমরা খতম হয়ে যাবো।

মহারাজা রঞ্জিৎ শিং তখনই লাহোরের কেল্লাদার উধাম শিং ও আরেক কমাণ্ডার হরি শিংকে ডেকে আনলেন। তাদেরকে বুধ শিং-এর পয়গাম শুনিয়ে হুকুম দিলেন, তারা যেন অতি ক্ষিপ্রগতিতে প্রয়োজনীয় সৈন্য নিয়ে আকোড়া রওয়ানা হয়ে যান।

সায়্যিদ আহমদ যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির হুকুম দিচ্ছিলেন বুধ শিং তখন আকোড়ার কাছে পৌঁছে গেছে। আর উধাম শিং ও হরি শিং তাদের বাহিনী নিয়ে অটাকের কাছের এক নদী অতিক্রম করছিলেন।

সায়্যিদ আহমদ শহীদের জন্য এজায়গাটি নতুন। লোকেরা তার আহ্বানে তার ঝাণ্ডাতলে সমবেত হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি সতর্কও ছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, এদের মধ্যে সন্দেহভাজন ও গাদ্দার থাকতে পারে। যখন উভয় পক্ষ তীব্র লড়াইয়ে নেমে পড়বে তখন যেন এক মুসলমান আরেক মুসলমানের পিঠে খঞ্জর না চালায়– সায়্যিদ আহমদ এটাই চাচ্ছিলেন না। এজন্য নতুন লোকদের যাচাই বাছাইয়ে অনেক সময় চলে যায়।

ফৌজ প্রস্তুত মোটামুটি করে ফেললেন হযরত সায়্যিদ আহমদ। ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ি এর সৈন্যসংখ্যা ছিলো কেবল দেড় হাজার। শিখ সৈন্য ছিলো প্রায় দশ হাজার। এর মধ্যে উধাম শিং ও হরি শিং-এর সেনাদলও ছিলো।

সায়্যিদ আহমদ তার এই অল্প সংখ্যক সৈন্যদলকে যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ি চার ভাগে ভাগ করলেন। ডান ব্যূহের কমাণ্ডার ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রা)। বাম ব্যূহের কমাণ্ডার সায়্যিদ মুহাম্মদ ইয়াকুব। তবে আকুড়ার যুদ্ধে সায়্যিদ ইয়াকুব থাকতে পারেননি। তার স্থলে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমাণ্ডার শায়েখ বাতান। অগ্র বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল। আর চতুর্থ পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন আল্লাহ বখশ খান। তিনি 'জমাদার আল্লাহ বখশ' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর (১২৪২ হিজরীর ২০ জমাদিউল আউয়াল) সায়্যিদ আহমদ শহীদ এই চার কমাণ্ডারকে নিয়ে আলোচনা সভা করেন। বৈঠক শুরু হয় জোহরের নামাযের পর।

এই বৈঠকে চার কমাণ্ডার ছাড়াও অন্যান্য সেনা উপদেষ্টারাও উপস্থিত ছিলেন, সায়্যিদ আহমদ শহীদ উপস্থিত সমবেতদের উদ্দেশ্যে বলেন—

'আমাদের গুপ্তচররা খবর দিয়েছে, শিখেরা সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার। ওরা ওদের ছাউনির আশেপাশে পাথরের দেয়াল দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এরা একে বলে 'সঙ্গর'। এর সঙ্গে এর আশেপাশে কাটাদার ঝোপ-ঝাড় দিয়ে এমনভাবে বেষ্টনী তৈরী করে রেখেছে যে, ঘোড়াও সেখান দিয়ে যেতে পারবে না। শিখেরা তাদের তাঁবু এভাবে সংরক্ষণ করে থাকে। আবার তাদের ছাউনির আরেক দিকে আছে নদী।...

'অথচ আমাদের মোট সৈন্যসংখ্যা দেড় হাজার মাত্র। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঐ ফরমানের কথা স্মরণ করুন যে– 'যদি ঈমানদাররা দৃঢ় পদ থাকে তাহলে তোমাদের বিশজন তাদের দুইশ জনের ওপর বিজয় লাভ করবে।' মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা সব সময়ই কম ছিলো। এই অপূর্ণতা পূরণ করতে হবে ঈমানী শক্তির তীব্রতা দিয়ে ...

'আপনারা সবাই হয়তো ভেবে থাকবেন এত অল্প সংখ্যক সৈন্য এত বড় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে পারবে না। এজন্য আমাদের নৈশ হামলা ও গুপ্ত হামলা চালাতে হবে। গুপ্ত হামলা চালিয়েই আমাদের এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে হবে গেরিলা হামলার পদ্ধতিতে। আপনাদের মধ্যে কে আজ রাতে গুপ্ত হামলা চালাতে প্রস্তুত?'

কে ছিলো এমন যে বলবে সে প্রস্তুত নয়! কিন্তু সায়্যিদ আহমদ শহীদের দৃষ্টি পড়লো জমাদার আল্লাহ বখশের ওপর। জমাদার আল্লাহ বখ্‌শ হিন্দুস্তানের 'আনাও' জেলার লোক। তিনি ইংরেজ সেনাবাহিনীতে জমাদার ছিলেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদের 'তাহরীকে মুজাহিদীনের' ঝাণ্ডা যখন উচ্চকিত হচ্ছিলো তখনই জমাদার আল্লাহ বখ্‌শ এসে তার হাতে বায়আত হন।

'প্রিয় মুজাহিদীন! সায়্যিদ আহমদ শহীদ বললেন— খোদায়ে যিলজাল আমাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শাসন

প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ ত্যাগ করিনি। আমরা ইসলামের নির্দেশিত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ ত্যাগ করেছি। হিন্দুস্তানকে কুফরের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে হবে।'

এখানে যারা উপস্থিত ছিলো তাদের জন্য এ ধরনের ওয়াজের প্রয়োজন ছিলো না। তারা ঘর থেকে বেরই হয়েছে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার জন্য। বৈঠকে বসার পূর্বে তারা সায়্যিদ আহমদের পেছনে জোহরের নামায আদায় করে। তারা যখন দুআর জন্য হাত উঠালো তাদের চোখগুলো অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। মুক্তাদীরা জানতো, তাদের ইমাম আল্লাহর দরবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন এবং বিজয় ভিক্ষা চাইছেন। অনেক মুক্তাদীর চোখও অশ্রু বন্যায় ভেসে গেলো।

বৈঠকে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ঈমানদীপ্ত বক্তৃতার পর জমাদার আল্লাহ বখ্শকে গুপ্ত হামলা সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা দিলেন। কিছু আলোচনা পর্যালোচনার পর গুপ্ত হামলার স্কিম তৈরী হয়ে গেলো কতজন গুপ্ত হামলায় যাবে তাও ঠিক করা হলো। এর মধ্যে হিম্মত খানও ছিলো। হিম্মত খান স্বেচ্ছায় এই গেরিলা দলে যোগ দেয়। মহারাজা রঞ্জিৎ শিং-এর দরবারে ওর সঙ্গে যে অপমানজনক আচরণ হয়েছে এর পতিশোধ নেয়ার জন্য সে অধীর হয়ে ছিলো। লাহোর থেকে ফিরতি সফর তার জন্য বড়ই কঠিন ছিলো। অনবরত ঘোড় সওয়ারি, বিশ্রামহীনতা ও কয়েক দিনের ক্ষুধার্ত অবস্থা তার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলো। কিন্তু তার পরও সে অনেক বলে কয়ে গুপ্ত হামলায় নিজের নাম লেখাতে সমর্থ হয়।

'আরে মুসলমানরা সংখ্যায় এত নগণ্য যে, আমাদের ছায়ারও তো মোকাবেলা করতে পারবে না ওরা'।

আকোড়ার নিকটবর্তী ছাউনিতে রাতে হরি শিং, বুধ শিং ও উধাম শিং এসব বলাবলি করছিলো। ওদের আওয়াজ বলে দিচ্ছিলো, ওরা মদের নেশায় চুর হয়ে যাচ্ছে।

হরি শিং বলে উঠলো— 'বুধ শিং তুমি তো সায়্যিদ আহমদের নাম শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। না হলে কি আর সেনা সাহায্য চেয়ে পাঠাও!'

'আরে হরি শিং!' বুধ শিং হরি শিং-এর রানে চাপড় মেরে বললো– 'ঠিক আছে লড়াই না হলেও কিছু দিন তো এখানে মৌজ করে যেতে পারবে। আর

আমি সায়্যিদ আহমদের নাম শুনে ভয় পায়নি ... তুমিও ভেবে দেখো ... এই মুসলে (মুসলমান শালারা) ... এদের ওপর ভরসা করা যায় নাকি? ... শালারা অনেক দিন এদেশে হুকুমত করেছে। এরা যদি একবার উঠে দাঁড়াতে পারে তাহলে না হরি শিং থাকবে না থাকবে বুধ শিং। তোমাদের মহারাজা রঞ্জিৎ শিং তো মুসলমানদের কিছুই মনে করছে না।'

কাছে বসে উধাম শিং হাসছিলেন। তিনিও বললেন, 'মুসলমানরা যদি নিজেদের আত্মহত্যা করতে না চায় তাহলে এই সামান্য সংখ্যক ফৌজ নিয়ে আমাদের মোকাবেলা করতে আসবে না।'

এই শিখ কমাণ্ডাররা যখন মদের নেশায় পুরো মাতাল হয়ে আবোলতাবল বকছিলো তখন শিখ ছাউনির পাথর বেষ্টনী ও কাটাদার ঝোপের আড়াল থেকে এক নওজোয়ান তাঁবুগুলোর ভেতরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছিলো। কখনো পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে কখনো চাপা পায়ে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁবুর ভেতরে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিলো সে। রাতের জমাট অন্ধকারে কিছুই তার চোখে পড়ছিলো না। পুরো তাঁবুপল্লী নীরব– শব্দহীন। এ ছিলো গভীর ঘুমের আলামত। কখনো ঘোড়ার আওয়াজ কখনো প্রহরীর বুটের খট খট খট আওয়াজ সেই নিঃশব্দ ভেঙ্গে দিচ্ছিলো। আবার সব নীরব হয়ে যাচ্ছিলো।

এই নওজোয়ান শিখ পুরো তাঁবু ছাউনির আশপাশ ঘুরে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে চলে গেলো। কিছু দূর যাওয়ার পর সে আওয়াজ শুনতে পেলো– 'এসে গেছো হিম্মত খান?'

সে আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো।

নওজোয়ান শিখ নয়, হিম্মত খান। শিখদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো। শিখ হিসেবে ওকে চমৎকার মানিয়েছিলো। শিখের ছদ্মবেশে সে দুশমনের ছাউনি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলো। তার অপেক্ষায় জমাদার আল্লাহ বখ্শ এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হিম্মত খান জমাদার আল্লাহ বখ্শকে ছাউনির বিস্তারিত অবস্থা জানালো এবং বললো, হামলার জন্য পরিবেশ বেশ চমৎকার।

এর আগে এই গুপ্ত হামলাকারী জানবাজরা স্থানীয় পাঠানদের সাহায্যে ছোট ছোট নৌকায় নদী পার হয়। কারণ, শুকনো পথে জায়গায় জায়গায় শিখসৈন্যরা টহল দিচ্ছিলো। আর সংখ্যায়ও তারা ছিলো অনেক। এজন্য নদী পথ ছাড়া উপায় ছিলো না। নদী পার হয়ে হিম্মত খানকে দুশমনের তাঁবুপল্লীর অবস্থা

দেখে আসার জন্য পাঠানো হয়। হিম্মত খান কাটাদার ঝোপঝাড় ও পাথর দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যেও একটা জায়গা আবিষ্কার করে, যেখান দিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে।

জামাদার আল্লাহ্ বখ্শ তার জানবাজ নৈশ হামলাকারীদের শেষ দিকনির্দেশনা দিলেন—

'আমরা সবাই পরস্পরকে পরস্পরের মনোমালিন্য, দুঃখ কষ্ট মাফ করে দিলাম। আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, কে জীবিত ফিরে আসতে পারবে। শুধু এটা মনে রাখবে, আজকের এই গুপ্ত হামলা তোমাদের আখেরী ফরজ- শেষ কর্তব্য। এরপর তোমরা আল্লাহর দরবারে চলে যাবে। এখন এই ফয়সালা নিজেরা করে নাও আল্লাহর সামনে আনন্দচিত্তে উপস্থিত হবে, না কর্তব্যে অবহেলা করে অভিশপ্তরূপে নিন্দিত হয়ে যাবে!'

কারো মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হলো না। কারণ, তাদের নীরবতা বজায় রাখার জন্য কঠিন নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তারা 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান বুকের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরে রেখেছিলো যেমন করে খাঁচায় প্রতাপশালী উন্মত্ত কোন প্রাণী বন্দি করে রাখা হয়। আর সে খাঁচা ভাঙ্গার জন্য খাঁচার শিকে থাবা মারতে থাকে।

❖❖❖❖❖

দশ হাজার শিখের তাঁবু পল্লী মরণ ঘুমে বেহুশ হয়েছিলো। দেশী মদের কড়া ঝাঁজ তাদেরকে গভীর ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মদ ছাড়া শিখেরা এমন অথর্ব হয়ে পড়ে যেমন পানি বিহীন চারা নেতিয়ে পড়ে। এজন্য শিখদের পানির আগে দেয়া হয় মদ। মদের তোড়ে নেশাকাতর হয়ে তারা লড়াই করে।

নৈশ প্রহরীরা জেগে ছিলো। তারা টহল দিচ্ছিলো। ও দিকে হিম্মত খানের পেছন পেছন নৈশ হামলাকারীরা ছাউনির পাথর বেষ্টিত ঐ স্থানে পৌঁছলো যেখান দিয়ে ভেতরে যাওয়ার কথা ছিলো। জমাদার আল্লাহ বখ্শ সে জায়গাটা দেখলেন এবং পাথর বেস্টনের বাইরের কাটাদার ঝোপঝাড় এক দিকে ঠেলে দিলেন। সেখান দিয়ে দু'জন জানবায হাল্কা পায়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়লো। এরা ভেতরের ঝোপগুলো সরিয়ে দিলো।

এবার আরো কিছু জানবায ভেতরে চলে গেলো। চারজন তলোয়ার তাক করে এক জায়গায় লুকিয়ে পড়লো। যাতে কোন প্রহরী আসলে তাকে নিঃশব্দে খতম করা যায়। হিম্মত খান যখন একলা এসেছিলো তখন এটা দেখতে পায়নি যে, প্রহরীদের হাতে কোন ধরনের অস্ত্র রয়েছে। তাদের কাছে বর্শা নয়, ছিলো দুইনলা বন্দুক।

জানবাযদের পুরো দল একে একে ভেতরে চলে গেলো। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁবুগুলোর রশি কেটে দিলো এবং ওপর থেকে বর্ষা মারতে লাগলো। তাঁবুর নিচে চাপা পড়া শিখেরা মরণ চিৎকার ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিলো না। হাঙ্গামার আওয়াজ শুনে এক প্রহরী বন্দুক দিয়ে এদিকে ফায়ার করলো, সবগুলো গুলি মাওলানা বাকের আলী আজীম আবাদীর বুকে গিয়ে গাঁথলো। তিনি বুক চেপে ধরে উঁচু গলায় আওয়াজ দিলেন–

'বন্ধুরা! আমার কাছ থেকে হাতিয়ার নিয়ে নাও। এটা আল্লাহ তাআলার আমানত। দুশমনের হাত যেন এতে না লাগে'– তিনি পড়ে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

এই গেরিলা হামলার তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ।

এরপর ভেঙ্গে পড়তে লাগলো এক গজবের পাহাড়। চার দিকে কেয়ামতের বিভীষিকা জ্বলে উঠলো। মুজাহিদরা তাঁবুর রশি কাটতে লাগলো আর বর্শা মারতে লাগলো পড়ন্ত তাঁবুতে। জানবাযদের এক দল এক তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিলো। দশ হাজার শিখের এই বিশাল সেনাবাহিনী। হড় বড় করে জেগে উঠলো। কিন্তু কয়েকশতো জাগার আগেই চির নিদ্রায় চলে গেলো। সঙ্গীদের আর্তনাদ ত্রাহি ত্রাহি আওয়াজ এবং আল্লাহু আকবারের গর্জন শুনে তারা পালানো ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবতে পারছিলো না।

খুব কম শিখই ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করলো। তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো ঠিক। কিন্তু লড়বে কার সঙ্গে। সেখানে পলায়নপর শিখ ছাড়া আর কাউকেই তাদের চোখে পড়ছিলো না।

জমাদার আল্লাহ বখ্শের নজর ছিলো শিখদের তোপখানার দিকে। তার সঙ্গে কয়েকজন জানবায পৃথক করে রেখে ছিলেন। তাদেরকে নিয়ে এক শিখ অফিসারকে পাকড়াও করলেন। তোপের মজুদ কোথায় এটা জানানোর বিনিময়ে তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেবেন– এভাবে তার কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন। শিখ অফিসার তাকে তোপের মজুদ যে তাঁবুতে ছিলো সেদিকে নিয়ে গেলো। আল্লাহ বখ্শ তাকে ভাগিয়ে দিলেন। এই তোপগুলো এখন মুজাহিদদের।

একটু পরই তাঁবু পল্লীর কয়েক জায়গায় আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠতে দেখা গেলো। ঘোড়ার ভয়ার্ত চিহি চিহি রব পরিবেশ আরো ভয়ংকর করে তুললো। ছাড়া ছাড়া গুলিও চলতে লাগলো।

❖❖❖❖❖

জমাদার আল্লাহ বখ্‌শ দেখলেন, যে উদ্দেশ্যে এই গেরিলা হামলা চালানো হয়েছে তার সে উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে। তাই তিনি কয়েকজন কাসেদকে বললেন, চিৎকার করে করে মুজাহিদদের ডেকে বলো, তাঁবু পল্লী থেকে বের হয়ে নদীর তীরে পৌঁছতে। জমাদার নিজেও উঁচু আওয়াজে নির্দেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু মুজাহিদরা নিজেদের সফলতায় এতই পরিতৃপ্ত ছিলো যে, কারো কোন দিক নির্দেশনা মানছিলো না।

দশ হাজার সৈন্যের ছাউনির পরিধি ছিলো দুই মাইল এলাকা জুড়ে। হাজার হাজার ঘোড়া, গরু, মহিষ ও এগুলোর গাড়ি, হাতিয়ার, বন্দুক, বারুদ এসব মুজাহিদরা একত্রিত করছিলো।

অবশেষে আকবর খান নামে সহকারী এক কমাণ্ডারের প্রচেষ্টায় মুজাহিদদের তাঁবু পল্লী থেকে বের করা সম্ভব হলো। তখনো বন্দুকের ফায়ার হচ্ছিলো। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন লড়াই হচ্ছিলো।

জমাদার আল্লাহ বখ্‌শ মুজাহিদদের তাঁবু পল্লী থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছুটাছুটি করছিলেন। হঠাৎ এক বন্দুকের ফায়ার তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহকারী কমাণ্ডার আকবর খান মুজাহিদদের নেতৃত্ব নিয়ে নিলেন নিজ হাতে।

ফজরের সময় মুজাহিদরা তাঁবু পল্লী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে চলে গেলো। একটি ফাঁকা জায়গায় সবাই ঘোড়া থামালো। তারা প্রথমে যে কাজটা করলো সেটা হলো, প্রথমে আযান দিয়ে সবাই ফজরের নামায আদায় করলো। তারপর শহীদদের মাগফিরাত কামনা করে দুআ করা হলো। ফজরের জামাআতে যারা অনুপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে হিম্মত খানও ছিলো। তার ব্যাপারে সাবই ধরে নিলো সে শহীদ হয়ে গেছে।

কমাণ্ডার উধাম শিং-এর তাঁবু ছিলো একটু দূরে। হামলার আওয়াজ শুনে তিনি হড়বড় করে উঠলেন। সে অবস্থাতেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। ভয়ে তিনি কেঁপে উঠলেন। তার দশ হাজার ফৌজকে পাইকারী দরে হত্যা করা হচ্ছিলো। তিনি বুধ শিং ও হরি শিং-এর তাঁবুর দিকে দৌড়ে গেলেন, কিন্তু তাদের তাঁবু খালি ছিলো। তিনি তো জানতে পারলেন না, মুসলমানদের এই হামলা দেখে তারা ভেবেছে বিরাট এক সৈন্য বাহিনী শিখদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে। এখন প্রাণ বাঁচানো ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না।

উধাম শিং দেখলেন তার ফৌজ সমানে কচু কাটা হচ্ছে। তার করার কিছুই ছিলো না। তিনি কমাণ্ডও নিতে পারছিলেন না। পালাতেও চাচ্ছিলেন না তিনি। তিনি জানতেন, কোন ফৌজের যখন এ অবস্থা হয় তখন কমাণ্ডার তাদেরকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে না।

তিনি তার অস্ত্রও কোষমুক্ত করলেন না। একদিকে হাটা ধরলেন। তাঁবুর ধিকি ধিকি আগুন ও মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছিলো, তিনি কোন দিকে যাচ্ছেন। শিখ সৈন্যদের লাশের গায়ে কখনো কখনো ঠোকর খাচ্ছিলেন। তখনো বন্দুক থেকে ফায়ার হচ্ছিলো অনবরত। হঠাৎ এক বন্দুকের সামনে তিনি পড়ে গেলেন, অধিকাংশ গুলি লাগলো তার দুই বাহুতে। একটা লাগলো বুকের এক পাশে। আরেকটা মাথার খুলি ছিড়ে নিয়ে গেলো। তিনি তাঁবু পল্লী থেকে বের হচ্ছিলেন। এই গুলির আঘাতেও তিনি হাটা থামালেন না। হেলে দুলে সামনে এগুচ্ছিলেন। এক সময় তাঁবুপল্লী থেকে বের হয়ে গেলেন। পাথর বেষ্টনীর গায়ে ধরে ধরে হাটছিলেন। কিন্তু বুলেটের ক্ষত থেকে অনবরত রক্তক্ষরণ তাকে বেশি দূর এগুতে দিলো না। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।

হিম্মত খান তাঁবু থেকে বের হলো তখন যখন তার সঙ্গীরা সবাই অনেক দূর চলে গেছে। এক জায়গায় দুই শিখ অতর্কিতে তাকে ধরে ফেলেছিলো, সে দু'জনের সঙ্গে তার তুমুল লড়াই হয়। বহু কষ্টে হিম্মত খান দুই শিখকে তাবুতে এনে চরম যখমী করে সেখান থেকে সরে আসে। সে তার অপমানের প্রতিশোধ এক প্রকার নিয়ে নিয়েছে। তাঁবুপল্লী থেকে বের হওয়ার সময় তাবুগুলোর ধ্বংস লীলা প্রত্যক্ষ করলো হিম্মত খান। তার কাছে বড় বিস্ময়কর ঠেকলো। তার কাছ দিয়ে শিখেরা পালানোর জন্য ছুটাছুটি করছিলো। তার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করছিলো না যে, তাদের এক মহান শত্রু এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

হিম্মত খান পাথর বেষ্টনী ঘেষে এগুচ্ছিলো। যেদিকে বেষ্টনী শেষ হয়েছে সেখান থেকে জমি ঢালু হয়ে নিচের দিকে চলে গেছে। সে নিচের দিকে নামতে লাগলো। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলো, তার দু'পাশে ছোট দুটি টিলা। এক পাশে দেখলো একটি লাশ পড়ে আছে। এতো তার কোন সাথী-সঙ্গীও হতে পারে। সে দৌড়ে সেদিকে গেলো।

না, একতার কোন সঙ্গী নয়। এক শিখ। ঘৃণায় তার মুখ কুচকে যাওয়ার কথা ছিলো। উচিত ছিলো তার সেখান থেকে তাচ্ছিল্য ভরে চলে আসা। কিন্তু একজন মৃত মানুষকে দেখলে আর ধর্মের ভেদাভেদের কথা তার মনে থাকে না।

চারদিক ফর্সা হয়ে আসছিলো। ভোরের আবচ্ছা আলোয় লাশের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি লাশের মুখের ওপর আটকে থাকতেই হিম্মত খান সহসা তাকে চিনতে পারলো। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো– 'উহহু, এতো উধাম শিং।

হিম্মত খান সঙ্গে সঙ্গে তার নাড়ি পরীক্ষা করলো। এখনো বেঁচে আছে। লাহোর কেল্লায় উধাম শিং তার সঙ্গে যে আচরণ করেছিলো এটা তার মনে পড়লো। তার কারণেই হিম্মত খান নিজের সঙ্গে তলোয়ার রাখতে পেরেছিলো। সসম্মানে মেহমানখানায় থাকতে পেরেছিলো। এমনকি রঞ্জিৎ শিং-এর দরবারে হিম্মত খানের দ্ব্যর্থহীন কথা শুনে যখন সমস্ত দরবারীরা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো তখন সে উধাম শিংকে দেখেছিলো যে, উধাম শিং এক মাত্র দরবারী ... যে নির্বিকার ভঙ্গিতে নিজ আসনে বসে ছিলেন, তলোয়ার থেকে তার হাত দূরে রেখেছিলেন। এও কি হিম্মত খানের সম্মানের জন্য নয়? প্রথম রাতে হিম্মত খানের প্রতিটি কথাও তো উধাম শিং বড় মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। এছাড়াও হিম্মত খান উধাম শিং-এর মধ্যে দেখছিলো একজন অন্তরঙ্গ মানুষের ছবি।

এসব কারণে উধাম শিংকে তার ভালো লেগেছিলো। সে বললো, 'উধাম শিং! জীবন মরণ আল্লাহর হাতে। কিন্তু আমি তোমাকে এখানে এভাবে মরতে দেবো না। তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো।'

উধাম শিং পড়ে ছিলেন বেহুশ হয়ে। শুনতে পাচ্ছিলেন না কোন কিছুই। এত বড় দেহধারী এক লোককে হিম্মত খান উঠিয়ে নিলো তার কাঁধে।

উধাম শিং-এর জ্ঞান ফেরার পর ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। এদিক ওদিক তাকালেন। ওপরে তাকিয়ে দেখলেন তার ওপর ছাদ। তার সামনে স্বল্প পরিচয়ের এক যুবক বসে আছে। উধাম শিং নিজের ডান বাহুও মাথাটি বেশ ভারি মনে হলো। শক্ত ব্যান্ডেজে বাঁধা মাথা ও ডান বাহুটি। তিনি হয়রান হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বিড় বিড় করে উঠলেন– 'হিম্মত খান? ... আমাকে তুমি এখানে নিয়ে এসেছো?'

হিম্মত খান যখন তাকে বললো কিভাবে এখানে উঠিয়ে আনা হয়েছে তখন তো উধাম শিং-এর হয়রানি স্তব্ধতায় রূপান্তরিত হলো। তিনি জানেন, এ এলাকার পথঘাট কেমন কঠিন। তাই তার মতো এমন দেহধারী কাউকে উঠিয়ে আনা সাধারণ ব্যাপার নয়।

'আমীরুল মুমিনীন তাশরীফ আনছেন'– এ সময় একজন ভেতরে এসে বললো।

হিম্মত খান উঠে দাঁড়ালো। সায়্যিদ আহমদ শহীদ ভেতরে এলেন। উধাম শিং উঠে বসলেন। সায়্যিদ আহমদের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'আমাকে বলা হয়েছে আপনার যখম ততটা গভীর নয়'– সায়্যিদ আহমদ উধাম শিং-এর মাথায় হাত রেখে বললেন– আশা করা যায় দ্রুতই সেরে উঠবেন। হিম্মত খান আমাকে বলেছে লাহোরের কেল্লায় আপনি তার সঙ্গে খুব ভালো আচরণ করেছেন। আমাদের ব্যবহারও আপনাকে হতাশ করবে না।'

'আমি আপনার কয়েদী– উধাম শিং বললেন– 'আমার সঙ্গে যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যবহার করতে পারেন আপনি। আমার হতাশার কারণ ঘটলেও আমি আপনার কিইবা বিগড়াতে পারবো।'

'আপনি আমাদের কয়েদী নন'– সায়্যিদ আহমদ স্মিত হাস্যে বললেন– 'যখম সেরে উঠা পর্যন্ত আপনি আমাদের মেহমান। তারপর আপনাকে একজন কেল্লাদারের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে বিদায় করা হবে। আমি আপনার জন্য দুআ করবো, আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

তিনি উধাম শিং-এর মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন।

উধাম শিং-এর দৃষ্টি দরজার মধ্যে আটকে রইলো যেখান দিয়ে সায়্যিদ আহমদ বের হয়েছিলেন।

'আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন'– কথাটার মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য নির্ভরতা খুঁজে পেলেন। এক অপার্থিব শক্তিমত্তা যেন তার কথার মধ্যে নিহিত ছিলো। এমনটি আর তিনি কারো মধ্যে দেখেননি। হিম্মতখানের কথায় তিনি চমকে ধ্যানভগ্ন হলেন–

'ইনিই সায়্যিদ আহমদ। আমাদের সালারে আলা এবং আমীরুল মুমিনীন। যার ব্যাপারে আপনি আমাকে লাহোরের কেল্লায় জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, এক আশ্চর্য আকর্ষণ টের পেলাম আমি উনার মধ্যে'– উধাম শিং বললেন।

উধাম শিংকে যে ঘরে রাখা হয়েছিলো সেটা ছিলো আকোড়া থেকে সামান্য দূরের ছোট একটি গ্রামের দালান বাড়ি। প্রতিদিনই উধাম শিং-এর যখমে নতুন পট্টি লাগানো হতে লাগলো। দেয়া হতে লাগলো খুবই উন্নতমানের খাবার

দাবার। সায়্যিদ আহমদ শহীদ তাকে দেখতে আসতেন প্রতিদিনই। উধাম শিং যে, শত্রু পক্ষ বা অমুসলিম-আচার আচরণে কেউ কখনো তা প্রকাশ করেনি। রোজ সকালে তার কানে আসতো বড় সুমধুর সুর ধ্বনি। উধাম শিং বুঝতে পারলেন কেউ কুরআন পড়ছে। আগেও তিনি কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনেছেন, কিন্তু এধরনের ভিন্ন ধরনের অনুভূতি কখনো তার হয়নি।

একদিন হিম্মত খান তার কাছে বসাছিলো। উধাম শিং যেন অস্থির হয়ে বলে উঠলেন–

'হিম্মত খান! আমি শিখ। আমার প্রতি এত মেহেরবান হয়ো না। আরে আমরা তো মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে মেরে আনন্দ বোধ করি। মুসলমান মেয়েদের ইজ্জত লুটে নেচে গেয়ে উঠি। মুসলমান শিশুদের হত্যা করে হো হো করে হেসে উঠি। তাহলে তোমরা আমার সঙ্গে কেন মেহমানের মতো আচরণ করবে?'

'আমরা আপনার ধর্ম দেখছি না'– হিম্মত খান বললো– 'দেখছি না যে, আপনি শিখ বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের। আমরা এটা মনে রাখি যে, আমরা মুসলমান। আমরা যুদ্ধ করি শুধু রণাঙ্গনে। কিন্তু তখনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, নিরস্ত্র ও যখমীদের ওপর হাত উঠাই না। দেখুন, আমাদের সালারে আলা আপনাদের মহারাজাকে ইসলাম গ্রহণের পয়গাম পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনাকে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেননি। কারণ, আপনি আমাদের অনুগ্রহে রয়েছেন এখন। আপনাকে কিছু বলার অর্থই হলো জোর জবরদস্তি করা।'

'যদি নিজ ইচ্ছায় আমি ইসলাম গ্রহণ করি?'

'তাহলে আগে আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, আপনি কারো ভয়ে বা কোন কিছুর লোভে ইসলাম গ্রহণ করছেন না।'

তারপর আরো কয়েকদিন কেটে গেলো। একদিন উধাম শিং বাইরে খানিক ঘুরে আসতে বের হলেন। সায়্যিদ আহমদ তখন সে এলাকাতেই ছিলেন। উধাম শিং খুঁজে খুঁজে সায়্যিদ আহমদের দেউরী বের করে সোজা তার কামরায় চলে গেলেন এবং তার পায়ে পড়ে বলতে লাগলেন– আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। তাকে বলা হলো, তিনি এখন সুস্থ-স্বাধীন। এখন ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারেন। কিন্তু তার এক কথা– তাকে মুসলমান বানাতে হবে। অবশেষে সায়্যিদ আহমদ তাকে কালেমায়ে তায়্যিবা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিলেন। তার নাম রাখলেন ইসমাঈল।

মুসলমান হয়ে তিনি জানালেন, তার মা ও একটি ছোট বোনও তার সঙ্গে এসেছিলো। তখন সেনা কমাণ্ডার অফিসাররা নিজেদের পরিবার নিয়েই যুদ্ধ সফরে বের হতো। উধাম শিংও তার বোন ও মাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তাদেরকে সেনা ছাউনিতে না রেখে আকোড়া থেকে একটু দূরের এক আত্মীয়ের গ্রামে রাখেন। তিনি বললেন, তাদেরকে তিনি এখানে নিয়ে আসতে চান। কারণ, সে এলাকাটি এক জালিম শিখ কমাণ্ডারের হাতে রয়েছে।

উধাম শিং এসব নিয়ে ভাবছিলেন। এসময় মুজাহিদদের এক গুপ্তচর খবর পাঠালো যে, ইসমাঈলের (উধাম শিং) ইসলাম গ্রহণের সংবাদ বুধ শিং পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বুধ শিং হুকুম দিয়েছে, ইসমাঈলের মা ও বোনকে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে। উধাম শিং-এর গাদ্দারীর শাস্তি তার মা ও বোনকে দিতে চাচ্ছিলো বুধ শিং। বুধ শিং-এর হুকুমে দশ বারজন শিখ সে গ্রামের দিকে রওয়ানাও হয়ে গেছে।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ এ দিক থেকে ইসমাঈলের সঙ্গে দশ বারজন মুজাহিদ পাঠিয়ে দিলেন। মুজাহিদদের এই দল যখন সেখানে পৌঁছলো পুরো গ্রামে তখন আতংক বিরাজ করছে। কারণ, বুধ শিং-এর সিপাহীরা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো। দেখা গেলো, শিখেরা একটি বাড়ি ঘেরাও করে আছে। উভয় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হলো। হিম্মত খান ও ইসমাঈল চেষ্টা করছিলেন বাড়ির ভেতর ঢোকার। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিলো। অবশেষে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে উভয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

ভেতরে গিয়ে দেখা গেলো, ইসমাঈলের মা তলোয়ারের আঘাতে মরে পড়ে আছে। তার বোন প্রতীম কোড়ের কাপড় ছিন্নভিন্ন। মাথার চুল এলোমেলো। প্রতীম কোড় জানালো, শিখ সিপাহীরা ভেতরে এসেই প্রতীম কোড়কে ধরে তার কাপড় ছিড়তে শুরু করলো। এসময় তার মা তলোয়ার বের করে শিখদের ওপর হামলা করে বসলেন। কিন্তু এক মহিলার পক্ষে দুই শিখের বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব ছিলো না। দু'জনে তাকে শেষ করে দিলো।

তারা প্রতীম কোড়কে বে-আবরু করতে চাচ্ছিলো। এসময় বাইরে মুজাহিদরা এসে হামলা চালায়। তখন ভেতরের দুই শিখ বাইরে গিয়ে শিখদের লড়াইয়ে শরীক হয়। এর পরপরই হিম্মত খান ও ইসমাঈল (উধাম শিং) ভেতরে চলে আসে। এভাবে প্রতীমের আবরু বেঁচে যায়। ওরা প্রতীমকে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়েই বের করে নিয়ে যায়।

মুজাহিদদের মধ্যে দু'জন শহীদ হয়। আর শিখদের মধ্যে মারা যায় নয় জন। বাকীরা পালিয়ে যায়।

পরদিন প্রতীম কোড়ও মুসলমান হয়ে যায়। তার নাম রাখা হয়, যায়নাব। ষোড়ষী কন্যা যায়নাব যেমন দেহ সৌন্দর্যে আকর্ষণীয় ছিলো তেমনি ছিলো তার অসাধারণ রূপের ছটা। এক নজর দেখেই হিম্মত খানের ভেতর আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। সুদর্শন হিম্মত খান তো যায়নাবের জন্য ছিলো নয়া জীবনদাতা স্বরূপ। ওদের মনের নীরব আকুতি যেন ইসমাঈলকে (উধাম শিংকে)ও ছুঁয়ে যায়। তার অনুরোধে সায়্যিদ আহমদ দু'জনকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

সায়্যিদ আহমদ ইসমাঈলের জন্য কান্দাহারের এক মুজাহিদ কন্যাকে ঠিক করেন। কিন্তু ইসমাঈল জানান, পরবর্তী লড়াইয়ে মুজাহিদদের বিজয়ের পরই তিনি বিয়ে করবেন। কিন্তু পরবর্তী লড়াইয়ে খাদী খান নামে এক মুসলমানের গাদ্দারীর কারণে ইসমাঈল (উধাম শিং) বেকায়দায় পড়ে শহীদ হয়ে যান।

কাজী আবদুল হালিম আসর আফগানী 'রুহানী কবিতা' গ্রন্থে লিখেছেন, অল্প সময়ের মধ্যেই ইসমাঈল সায়্যিদ আহমদ শহীদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। তাই তার লাশ দেখে সায়্যিদ আহমদ অঝোর ধারায় কেঁধে উঠেন। রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন–

'হায়! শেষ পর্যন্ত আমার প্রিয় বন্ধুটিও শাহাদাতের পাগড়ী পরে নিলো!'

# প্রেম ও যুদ্ধ

আমার সামনে এই যে আদিগন্ত মরুর বিস্তৃতি, আমার চারপাশে তরঙ্গায়িত বালির সমুদ্র, এটাই আমার দুনিয়া। এটাই আমার জীবন। এই ধূলির বিছানাতেই আমার মৃত্যু। এই বালির দুনিয়া আমার খুনের পিয়াসী নয়। কিন্তু আমি একে আমার রক্ত পান করাবো।

বালিময় এ মরু আমার-আমাদের। ফ্রান্সের নয়।

নিজ দেশের ধূলিকণা অন্য দেশের সোনার চেয়ে দামী-পবিত্র।

আমি এসব কথা জানতাম না। শুধু জানতাম, আলজাযায়ের আমার দেশ। ফ্রান্সীরা তা অন্যায়ভাবে দখল করে আমাদের মাথার ওপর রাজত্ব করছে। তারা আমাদের ভূমির উৎপন্ন ফসলের মালিক বনে যাচ্ছে জোর জবরদস্তি করে। মালিক আমাদের ইজ্জত সম্মানের; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের লালিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের।

আমি এও জানি, আমাদের নেতারা, যুবক ভাইয়েরা ফ্রান্সীদের এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন। এ হলো পরাধীনতা থেকে মুক্তির যুদ্ধ, যুদ্ধ স্বাধীনতার। কিন্তু দখলদারদের মতে এ হলো বিদ্রোহ। দেশদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ। এর জন্য এরা যে শাস্তি বরাদ্দ রেখেছে তা শুনলে সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠবে।

আরেকটা রহস্যের কথা জানি আমি। আড়াই বছর ধরে আমার বাবা আমাদের বাড়ি থেকে গায়েব। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো– এজন্য আমার মা মোটেও চিন্তিত ছিলেন না। মা আমাকে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছিলেন, ফ্রান্সীদের বিরুদ্ধে যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে আমার বাবা সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এই পুলিশের ওপর হামলা করছেন তো আবার কয়েদও হচ্ছেন। কৌশলে আবার ছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন। গ্রেফতার হলে

আবার জেল থেকে পালিয়েও আসছেন। এসে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নতুন উদ্যম নিয়ে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। সয়ে যাচ্ছেন ফ্রান্সী পুলিশের অমানবিক নির্যাতন।

যার ভেতরে তার দেশের শুধু ভালোবাসা নয় বরং ভালোবাসার উন্মত্ততা আছে এবং নিজের রক্তাক্ত মাথায় প্রিয় মাতৃভূমির পতাকাটি সমুন্নত রাখার সংকল্পে শক্তিমান দৃঢ়চেতা একটি মন আছে; তারাই পায়ে সব নির্যাতন অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে নিতে।

অনেক কথা আমার বাবাও আমাকে বলেছেন। আমার কাছে মনে হতো এসব স্বপ্নযোগে পাওয়া কোন দৈব বাণী। যেন স্বপ্নে আমার বাবা এসেছিলেন এবং আমার রক্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে চলে গেছেন। ঘুম থেকে জাগার পর মা জানাতেন, হ্যাঁ সত্যিই গত রাতে তোমার বাবা এসেছিলেন।

এটা দু'বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন উনিশ। কয়েক মাস বেশিও হতে পারে। আমি ছিলাম গভীর ঘুমে। বাবা আমাকে জাগালেন। বড় কষ্টে আমার চোখের পাতা খুললো। মা ঋজু ভঙ্গিতে বাবার বাহু পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেক দিন পর বাবাকে দেখছিলাম আমি। কিন্তু আমার চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসছিলো। বাবার ভ্রুক্ষেপ ছিলো না সেদিকে। তিনি বলে যাচ্ছিলেন বড় দ্রুত। সব কথা মনে থাকার কথা নয়। পরে মা অবশ্য আমাকে বলে দিয়েছিলেন। সেদিন বাবার মধ্যে আমি কী যে এক অপার্থিব তেজ দেখেছিলাম।

সে রাতেই আমি জানতে পেরেছিলাম, বাবা গ্রেফতার হয়ে গিয়ে ছিলেন। একটা কথা বলা উচিত এখানে যে, বাবা কোন মামুলি লোক ছিলেন না। কাষ্টম্‌স প্রশাসনের অফিসার ছিলেন তিনি। আরবীর মতো ফ্রান্সও বলতে পারতেন চমৎকার। যে স্কুলে আমাকে ভর্তি করানো হয়েছিলো সেখানে বড় বড় অফিসার ও আমীর ঘরনার ছেলে মেয়েরা পড়তো। ফোর্থগ্রেড গভর্নিং বডির ছেলে মেয়েরাও আমাদের সঙ্গে পড়তো। ফ্রান্সী ছাড়াও ইতালি, জার্মানি, স্পেনিশ ও ইংলন্ডের ছেলে মেয়েরাও পড়তো এখানে। অর্থাৎ আমিও আমীর ঘরনার সন্তান ছিলাম। ছিলাম এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ছেলে।

আমি আসলে বলতে চাই, জাতির নেতৃস্থানীয় ও বুদ্ধিজীবীরা যদি মনে করতে থাকে, ত্যাগ, সংগ্রাম ও অত্যাচার সহ্য করা শুধু গরিবদের কাজ তাহলে সে জাতির অন্য জাতির বর্বর শ্রেণীর গোলাম বনে গিয়ে জীবন যাপন করতে হয়। কিন্তু আলজাযায়েরের মুসলমানরা সে রকম ছিলো না। আমরা আমাদের

ভূখণ্ড একদিন না একদিন ঠিকই স্বাধীন করে নেবো। কারণ, আমাদের আমীর, ফকির, অফিসার, কেরানী, দুর্বল, সবল সব এক ঝাণ্ডা তলে সমবেত হয়েছে।

চাকুরিতে থাকতেই বাবা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করা শুরু করেন। বাবার কাজ ছিলো, ফ্রান্সীদের অস্ত্র গোলাবারুদ ও যুদ্ধের অন্যান্য রসদপত্র যেসব গাড়িতে বহন করে নিয়ে যেতো সেগুলোর খবর তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়ে দিতেন। অনেক ফৌজি তথ্যও সরবরাহ করতেন। গেরিলা মুজাহিদদের সঙ্গে তার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিলো। মা আমাকে বলেছেন, ফ্রান্সের গোয়েন্দা পুলিশের সন্দেহভাজন তালিকায় বাবার নাম উঠে যায়। তারপর একদিন বাবা গ্রেফতার হয়ে যান।

এর ছয় মাস পর। এক রাতে বাবা আমাদের বাড়িতে এলেন। তিনি জাগালেন আমাকে। খুব তাড়াহুড়া করছিলেন। ঘরের আবছা আলোয় দেখতে পেলাম, তার স্বাস্থ্য অনেকটা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু চোখ দুটো হয়েছে আরো তীক্ষ্ম, ক্ষুরধার। মুখের পেশীগুলো আরো দৃঢ়। সমস্ত অবয়ব থেকে যেন কঠিন কোন অঙ্গীকারের দীপ্তি ঠিকরে বেরোচ্ছিলো।

'আমার প্রিয় বেটা! কোন ভূমিকা ছাড়াই তিনি আমাকে বলতে লাগলেন– 'আমাকে ভুলে যেয়ো। কিন্তু আমার কথাগুলো ভুলো না। আমাদের আর মিলন নাও হতে পারে। জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছি আমি তাই এখন আর প্রকাশ্যে এদিকে আসতে পারবো না।...

'আমি মারা যাই বা জীবিত থাকি তোমার দায়িত্ব হলো এদেশ স্বাধীন করা। তোমাকে কি করতে হবে তোমার মা তোমাকে বলে দেবে। আমার ওসিয়ত মনে রেখো। আর মাথা থেকে বের করে দাও, তুমি কোন অফিসারের ছেলে। তোমাদেরকে আমি যে সুখের জীবন দিয়েছিলাম তাও ভুলে যাও।...

'তোমাকে হয়তো মরুর তপ্ত বালিতে কোন ফ্রান্সীর গুলিতে বা ক্ষুৎ পিপাসায় মরতে হতে পারে। কিন্তু মরাটা কোন বাহাদুরী বিষয় নয়। মেরে মরার মধ্যে বীরত্ব আছে। নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ঝাপিয়ে পরে শত্রুকে ঘায়েল করে জীবিত ফিরে আসাকেই বীরত্ব বলে ... আমি দেরী করতে পারবো না। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে'– মনে আছে আমার বাবা আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে উঠেন– 'জেগে উঠো আমার বেটা! জেগে উঠো। যে কওমের নওজোয়ানরা ঘুমিয়ে পড়ে সে কওমের ভাগ্যের চাকাও থেমে যায়।'

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর আমার মাকে বললাম, মা! কাল রাতে স্বপ্নে বাবাকে দেখেছি। বাবা আমাকে এই এই বলেছেন স্বপ্নে। মা মুচকি হেসে বললেন, স্বপ্নে নয় বাস্তবেই তুমি তাকে দেখেছো।

'তিনি কাল রাতে এসেছিলেন– মা বললেন, 'তিনি যা বলে গেছেন তা ভুলবে না কখনো। তোমার বাবাকে গতকাল রাতে এক জেল থেকে স্থানান্তর করে আরেক জেলে নিয়ে যাচ্ছিলো ফ্রান্সীরা। কয়েদীদেরকে রাতেই জেল বদল করা হয়। কারণ, দিনে মুক্তিযোদ্ধারা তা জেনে ফেলে এবং গাড়িতে হামলা করে কয়েদীদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু রাতের বেলা হলে মুক্তিযোদ্ধারা আর টের পায় না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা এখন এটা জেনে ফেলেছে। তোমার বাবাকে নিয়ে গাড়ি যখন অতি নির্জন এক জায়গায় দিয়ে যাচ্ছিলো তখন গাড়িতে আচমকা হামলা হয়। কয়েকজন কয়েদী মারা যায়। মারা যায় কয়েজন পুলিশও। হামলাকারীদের একজন শহীদ হয়। তোমার বাবা অক্ষত অবস্থাতেই পালাতে সক্ষম হন। তারপর লুকিয়ে ছাপিয়ে এখানে এসে তোমাকে ওসিয়ত করে যান।'

'বাবার লাগেনি তো?' আমি পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'না, সামান্য আচড়ও লাগেনি। লাগলে কি এখানে আসতে পারেন'– মা বললেন সামান্য হেসে।

মার কথায় ও চেহারায় আফসোস বা চিন্তার সামান্য লক্ষণও ছিলো না। তার পর বাবা রাতে আমাকে যা বলেছিলেন মা সেগুলো আবার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন।

'তোমার বাবার পথ ধরে তোমাকে যেতে হবে– মা বললেন, 'তিনি শহীদী জীবন ও মুক্তিযোদ্ধাদের পথে তার স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছেন গতকাল রাতে। এই চিহ্ন তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যেখানে এই পদচিহ্ন শেষ হয়ে যাবে সেখান থেকে শুরু হবে রক্ত ফোটার পিচ্ছিল পথ। এটা হবে তোমার বাবার রক্ত। জাতির সন্তানদের পথ নির্দেশ করে তাদের পিতার রক্তমাখা পদচিহ্ন।'

আমার জন্মের পূর্বেই ফ্রান্সীরা আল জাযায়ের দখল করে বসে। কিন্তু তখন সেসব বীর যোদ্ধা মহিয়সী নারীরা কোথায় ছিলো যারা দেশের মুক্তির জন্য নিজের স্বামী, প্রিয়জন, গর্ভের সন্তানকে উৎসর্গ করে দিতো। আসলে যে ধর্ম যে ইসলাম তাদের প্রাণের আদর্শ ছিলো, অস্তিত্বের ভিত্তি ছিলো তা তারা বিক্রি করে দিয়ে ছিলো। বিধর্মীদের রঙ-সজ্জায় তাদের জীবনকে রঞ্জিত করতে চেয়েছিলো। তাদের আদর্শহীন ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষাক্ত শরাব আকণ্ঠপান করতে শুরু করলো।

অবশেষে জাতির পিতাদের অন্তরের সুপ্ত ঈমানের প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপ পূর্ণমাত্রায় প্রজ্জলিত হয়। জেগে উঠে দেশের সন্তানরা। মায়েরা বুকের সন্তানকে উৎসর্গ করে দেয় গোলাবারুদের ছায়াতলে। স্ত্রীরা নিজেদের ভালোবাসা অর্পণ করে কওমের রক্তাক্ত কদমে।

এর পরের রাতের ঘটনা। মা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। বাড়ির বাইরে গাড়ির ব্রেক করার শব্দ হলো। আম্মার চেহারায় ভয়ের ছায়া নেমে এলো। তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিস ফিস করে বললেন– 'ঐ যে এসে গেছে।'

'কে? আব্বা?' আমি খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'না' ...

'পুলিশ ... মনে হয় ফৌজ'।

দরজার শুধু কড়া নড়ে উঠলো না; যেন দরজা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করলো। কেউ চিৎকার করে বললো– 'দরজা খুলে দাও, না হয় আমরা ভেতরে ঢুকে গুলি করবো।'

মা ক্রুদ্ধ হয়ে বড় দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তার পেছন পেছন গেলাম। মা দরজা খুলতেই চারজান আর্মি এক ঝটকায় ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। ঢুকেই সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো। প্লেট গ্লাস, কাপ পিরিচ, ফার্নির্চার রাইফেলের বাট দিয়ে গুড়ো করতে লাগলো। সারা বাড়িতে ছয়টি কামরা ছিলো। প্রতিটি কামরার আসবাবপত্র ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। ছাদেও গেলো। কোথাও তাদের কাংখিত কোন কিছু পেলো না।

নিচে এসে মাকে ও আমাকে আসামীর মতো তাদের সামনে দাঁড় করালো। আমার দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগলো তখন। ফ্রান্সীরা তো আমার আজন্ম শত্রু। কিন্তু সেদিন আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, এই ঘৃণ্য শত্রুরা আমাদের আত্মসম্মান ও জাতীয় ইজ্জত আবরুর ওপর নোংরা পা দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মহান এক ধর্মের অনুসারী হয়েও ঐ কাফেরদের চোখে আমরা অতি নিকৃষ্ট প্রাণীরও অধম।

'সে কোথায়?' এক সার্জেন্ট আমার মাকে ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো।

'কে?'।

'তোমার স্বামী। সে এখানে এসেছিলো।'

'ও তো ছয় মাস ধরে লাপাত্তা। আমি কি করে বলবো সে কোথায়?'

এর মধ্যে আমাদের পাশের বাড়ির এক লোক তার মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এলেন। তার মেয়ের নাম মারকোনী। বয়স পনের-ষোল। ওদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো। ওরা ইতালির লোক।

মারকোনী আর আমি এক সঙ্গে পড়তাম। দু'জনে দু'জনার বেশ ঘনিষ্ঠও ছিলাম। অবশ্য ইতালি বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের ছেলে মেয়েরা এ স্কুলে পড়তো। কিন্তু মারকোনীর মতো অন্য কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো না। মারকোনী ক্লাসে আমার সঙ্গে বসতো, খেলা করতো, এমনকি একই স্কুল কোচে করে আমরা স্কুলে আসা যাওয়া করতাম।

মারকোনীর বাবা ছিলেন খাদ্য ভবনের অফিসার। আমার বাবার খুব বন্ধু। আর মারকোনীর মা ছিলেন আমার মার বান্ধবী।

'আপনারা কেন এসেছেন?' সার্জেন্ট মারকোনীর বাবাকে জিজ্ঞেস করলো। ইউরোপীয় মনে করে উনার সঙ্গে সমীহ্ করেই বললো।

'আমি এই ভদ্র মহিলা (আমার মা) ও তার ছেলের জামিন হচ্ছি'– মারকোনীর বাবা বললেন– 'এই মহিলার স্বামী আসামী বা দেশদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু উনাকে আমরা পনের-শোল বছর ধরে চিনি। তিনি আপনাদের ওয়াফাদার নাগরিক। তাছাড়া উনি নিজেও তো তার স্বামীর অত্যাচারে জরিত। তার ব্যাপারে আপনাদের কোন আশংকা থাকা উচিত নয়। ইনি তো শিক্ষিতও নন, সাধারণ গ্রাম্য মহিলা।'

মারকোনীর বাবাকে মিথ্যা বলতে হলো। আমার মা আমার বাবার কাছে থেকে কোন দিন কোন কটু কথাও শুনেননি। অশিক্ষিত বা বুদ্ধু-গ্রাম্যও নন আমার মা। উনি হায়ার সেকেন্ডারী পাশ। তবে মারকোনীর বাবার আমাদেরকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টার কৌশল মা বুঝে ফেললেন। তাই আমার মাও বুদ্ধু বনে গেলেন তখন।

'আপনি ইউরোপীয় বলে আপনার জামানত গ্রহণ করছি– সার্জেন্ট মারকোনীর বাবাকে বললো– আপনি মুসলমান হলে এদের সঙ্গে আপনাকেও গ্রেফতার করতাম'– সার্জেন্ট বড় ঘৃণা ভরে আমার দিকে আঙ্গুল তাক করে বললো– 'এটা সাপের বাচ্চা। এই বয়সের ছেলেরা আমাদেরকে নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। কয়েদীদের গাড়িতে যারা হামলা করে এদের মধ্যে এ পর্যন্ত পাঁচজন মারা গেছে। এই পাঁচজনের বয়সই সতের থেকে আঠার এর মধ্যে। আমি ওদের লাশ দেখেছি। সবার আগে ঐ হারামী বদ মুসলমানদের ছেলেগুলোকে আমাদের খতম করতে হবে।'

আমার মা আমাকে ছো মেরে কাছে টেনে নিয়ে চেপে ধরলেন। বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বুদ্ধু আর মজলুম মায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন–

'আমার বাচ্চা এমন নয়। সে তার বাবার পথে যাবে না কখনোই। ওর বাবা চলে যাওয়াতে আমি অনেক খুশি।'

'ও আমার ক্লাস মেট'– মারকোনীও আমার পক্ষে বললো এবং আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি গভীর করে যেন বললো, চুপ থাকো। কথা বললেই বিপদে পড়ে যাবে।

আমি দাঁত দিয়ে আমার ঠোঁট কাটতে লাগলাম। ফ্রান্সীরা আজ আমাদেরকে মানুষই মনে করছে না। এমন ব্যবহার করছে যেন আমরা কোন ইতর প্রাণী। আমি সার্জেন্টের দিকে তাকালাম। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক। সে মারকোনীর দিকে তাকিয়ে হাসছিলো মুচকি মুচকি। মারকোনী অত্যন্ত রূপসী ছিলো। লম্বাটে শারীরিক গঠন ওর সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তুলেছিলো।

মারকোনীর সুপারিশ কাজে লাগলো। সার্জেন্ট মাকে ও আমাকে আরো কিছুক্ষণ ধমকিয়ে মারকোনীর বাবার সঙ্গে বাড়ির বাইরে চলে গেলো। আমি বাইরে বের হয়ে দেখলাম, সার্জেন্ট মারকোনীদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। সিপাহীরা বাইরে গাড়িতে উঠে বসছে। সার্জেন্টের চোখ দেখেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে ছিলাম যে, সে এখন মারকোনীর পিছু নেবে। অবশ্য মারকোনীর তাকে অপছন্দ করারও কিছু নেই। একে তো ধর্মে বর্ণে মিশে গেছে ওরা। তারপর এই বয়সেই ছেলেটি সার্জেন্ট পদে উন্নীত করেছে। এমন পাত্র কেই বা হাতছাড়া করতে চায়।

থাক এজন্য আমার কোন আফসোস ছিলো না। আমি বা মারকোনী আমরা কেউ তো কখনো কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তাহলে এক সার্জেন্ট ওদের ঘরে যাওয়াতে আমার তো কোন কিছুর ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা চেপে বসলো, আমি আমার বাবার পথে কি করে চলবো? কে আমাকে ট্রেনিং দেবে? কার সঙ্গে আমি দেখা করবো? আমি কোথায় যাবো, কে আমাকে নিয়ে যাবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে পেয়ে গেলাম। মা আমাকে প্রথম সবক দিলেন–

'যদি আচমকা এভাবে পুলিশ এসে পড়ে তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ভিখিরী বিড়াল বনে যাবে। পুলিশরা গালিগালাজ করলে মাথা নামিয়ে ফেলবে। আবেগ ও জযবার আগুন তখন বুকের মধ্যে চেপে রাখবে ...

'আমি দেখছিলাম, ঐ পুলিশদের সামনে তোমার চেহারা রাগে লাল হয়ে যাচ্ছিলো। তুমি যদি রাগের সামান্য প্রকাশও ঘটাতে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতো। এতে কি লাভ হতো? জাতির এক সম্ভাবনাময়ী যুবক ধ্বংস হয়ে যেতো। তোমাকে তোমার বাবার মতো দক্ষ গেরিলাদের মতো যমিনের নিচ থেকে হামলা করতে হবে। মনে রেখো, ফ্রান্সীদের পা টলে উঠেছে। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদেরই হবে।'

এরপর আরো কয়েক দিন সার্জেন্টকে মারকোনীদের ঘরে আসতে দেখেছি আমি। কিন্তু আমার মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। আমি জানতাম, আলজাযায়েরের কোন যুবক যদি কোন মেয়ের পাল্লায় পড়ে যায় তাহলে তার আর রেহায় মেলে না। আমি আরো আগ থেকেই বুঝতে পারতাম, ফ্রান্সীরা মুসলমানদেরকে বিলাসী জীবনে ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছে। কোথাও যাতে ভালো-মন্দ, শালীন ও অশালীনতার ভেদাভেদ না থাকে; তারা সে চেষ্টাই করছে। মারকোনীকেও আমি তাদেরই কোন ইন্ধন মনে করতে লাগলাম।

আমার মা আমার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এর তিন মাস পরের কথা। একদিন মারকোনী আমাদের ঘরে এলো। সার্জেন্টের আনাগোনার পর থেকে মারকোনী আমাদের বাড়িতে খুব কমই আসতো। আগে তো তার দিন রাত আমাদের এখানেই কাটতো। মারকোনী এসে আমাকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো–

'তোমাদের ঘরে বিপদজনক কিছু নেই তো? ... মানে কোন অস্ত্রটস্ত্র বা ইমোনেশন?'

'আমাদের বাড়িতে এসব কোত্থেকে আসবে?' আমি কিছুটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললাম।

'শামস! মারকোনী যেন অনুনয় করলো– 'আমার কাছে কোন কিছু গোপন করার চেষ্টা করো না। আমি যা বলছি সত্য বলছি এবং তোমার ভালো চাই বলেই বলছি। এতে তোমার মারও সম্মান নিহিত রয়েছে। আমি জানি তুমি কি করছো?'

'মনে হচ্ছে ফ্রান্সী সার্জেন্ট তোমার আপাদ মস্তকই পাল্টে ফেলেছে'– আমি বিদ্রুপ করে বললাম– 'শেষ পর্যন্ত তুমি গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিয়েছো।'

'শামস! সে আমাকে একটা ঝটকা দিয়ে বললো– 'আমি সত্যিই গোয়েন্দাগিরি করছি। আমি গোপন একটি তথ্য দিতে এসেছি। আজ রাতে

তোমাদের বাড়িতে পুলিশ রেড করবে। ঘরে যদি এমন কিছু থেকে থাকে তা মাটির নিচে দাবিয়ে দাও। অথবা আমার কাছে দিয়ে দাও। না হয় কোথাও গায়েব করে দাও।'

মারকোনী চলে গেলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মারকোনীর কথা বিশ্বাস করা উচিত কি না তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম। মাকে জানালাম। মা বললেন, কোন অমুসলিম মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। ইউরোপের কোন লোকের ওপরই ভরসা করা যায় না। আসলে মারকোনী জানতে এসেছিলো আমাদের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কিনা।

তবুও আমাদের ঘরে দুটি খঞ্জর ছিলো। ফ্রান্সীদের আইনে এটা রাখাও অপরাধ। এছাড়া ছিলো ৩২ কিলোবোর এর একটি পিস্তল। যার মেগাজিনে এক সঙ্গে এগারটি গুলি ভরা যেতো। দশ-বার দিন আগে পিস্তলটি আমাদের ঘরে আসে। আমার মার জানাশোনা এক লোক এটি নিয়ে এসে ছিলো। এটা না কি আমার বাবা আমার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বাবার জীবন কাটছে এখন মরুর ধূলিকণার মধ্যে।

মারকোনী যেদিন আমাকে সতর্ক করতে এসেছিলো সেদিন সন্ধ্যাতেই অতি নোংরা কাপড়ের এক ভিখিরী আমাদের দরজায় এসে হাক ছাড়লো। আমি দরজা খুলতেই তিনি আমাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তার লম্বা দাড়ি ও চুল থেকে বিকট গন্ধ আসছিলো। কাপড়ও দুর্গন্ধযুক্ত এবং শত ছিন্ন। আমি তাকে বাধা দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি ভেতরের কামরায় ঢুকে পড়লেন এবং হো হো করে হেসে উঠলেন।

'যদি নিজের ছেলেও আমাকে চিনতে না পারে তাহলে ফ্রান্সী পুলিশের বাপেরও সাধ্য নেই যে আমাকে চিনবে'– হাসতে হাসতে বললেন তিনি– 'তাহলে আমার ছদ্মবেশ ভালোই হয়েছে'।

'আপনার এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়'– আমি বাবাকে বললাম।

ফ্রান্সী সার্জেন্টের ঘটনা ও মারকোনীর সঙ্গে তার নতুন পরিনয়ের সম্পর্ক, সর্বশেষ আজ মারকোনী কি বলে গেছে বাবাকে সব খুলে বললাম।

বাবা আমাকে কিছু টাকা দিলেন। তারপর বললেন– 'ঐ মেয়ের উদ্দেশ্য যাই থাক, তবে সে মিথ্যা বলেনি। এই আমার এখানে আর থাকা উচিত হবে না। আমি আবার আসবো ইনশাআল্লাহ। ঘরে যাই আছে লুকিয়ে ফেলো।'

বাবা চলে গেলেন। এর এক ঘন্টা পরই আমাদের বাড়ির দরজায় কি যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। এর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ছাদের ওপর কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। মা দরজা খুললেন। চারজন পুলিশ চোখ ধাঁধানো টর্চের আলো জ্বেলে ভেতরে ঢুকলো। আরো দু'জন ছাদ থেকে নেমে এলো। তারপর সবাই এক যোগে বাড়ির ভেতর তল্লাশি শুরু করলো।

আমি খঞ্জর ও পিস্তলটি বাড়ির বাগানের এক কোণে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। পুলিশ আমাদের ঘরের আসবাবপত্রের এমন হাল করলো যেন ডাকাত দল ডাকাতি করে গেছে। পুলিশের এই দলের সঙ্গে অন্য একজন সার্জেন্ট ছিলো। সার্জেন্ট আমাকে ও মাকে তার সামনে এনে দাঁড় করালো। যেন কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

'তুমি স্কুলে যাওয়া কেন বন্ধ করলে?' সার্জেন্ট আমাকে রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'ওকে আমিই স্কুল থেকে ফিরিয়ে এনেছি– মা জবাব দিলেন, 'আপনি নিশ্চয় জানেন, ওর বাবা জেলখানায় পড়ে আছে। আয় রোজগার সব বন্ধ। ওকে কি দিয়ে পড়াবো আমি? তা ছাড়া বাইরের অবস্থা খুব খারাপ। আমি চাই না, আমার একমাত্র ছেলে এই জটিল পরিস্থিতির শিকার হোক।'

'তোমার স্বামী জেল থেকে পালিয়েছে'– সার্জেন্ট বড় তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো– 'তুমি ভালো করেই জানো সে কোথায় আছে এখন। তার এই ছেলে বিদ্রোহীদের কাছে যাতায়াত করে। যদি তোমার স্বামীর সন্ধান দিয়ে দাও তাহলে শান্তিতে কাটাতে পারবে বাকি জীবন। আর এই ছেলের ওপর নজর রেখো। যদি সে ধরা পড়ে তাহলে সারা জীবনেও ওকে ফিরে পাবে না।'

ফেরাউনি দম্ভ দেখিয়ে ওরা চলে গেলো। মা অনেক্ষণ পর্যন্ত দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিড় বিড় করে বললেন,

'আমি আমার একমাত্র ছেলেকে আমি আল জাযায়েরের মাটিতে উৎসর্গ করে দিলাম।'

একটু পর মারকোনী এসে উপস্থি হলো।

'এখন তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে শামস! আমি ফ্রান্সী না, ইতালিয়ান' মারকোনী বললো।

'তাহলে ঐ সার্জেন্ট তোমাদের ঘরে কেন আসে? তুমি ওর সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘোড়া ফেরা করো কেন?' আমি সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'বাবা আমাকে উনার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন... এ বিয়ে ফেরানো যাবে না'– হঠাৎ করেই তার গলা ধরে এলো– 'কিন্তু আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না। তুমি আমার শৈশবের সঙ্গী। অতীত স্মৃতিগুলো ভুলে যাও... আর হ্যাঁ, তুমি সত্য পথেই আছো। আমার বিয়ে হচ্ছে এক ফ্রান্সী সার্জেন্টের সঙ্গে। ফ্রান্সের হুকুমমতের সঙ্গ নয়'– এবার কেঁদেই ফেললো– 'আমাকে ভুলে যাও... আমার যে এছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না'– একথা বলে মারকোনি ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

এর মাসখানেক পর ঐ সার্জেন্টের সঙ্গে মারকোনীর বিয়ে হয়ে গেলো। তত দিনে আমি লুকিয়ে ছাপিয়ে মোটামুটি ফৌজি প্রশিক্ষণ নিয়ে নিয়েছি। আরো সপ্তাখানেক পর মারকোনী তার স্বামীর সংসারে চলে গেলো।

এক রাতে আমার বাবা আবার সেই ভিখিরীর বেশে এলেন। তিনি মাকে বললেন,

'আমি তোমার শাম্‌সকে নিয়ে যাচ্ছি। ওকে খোদা হাফেজ বলো। কখনো কখনো আমার মতোই এসে দেখা করে যাবে।'

মার দু'চোখ ভরে অশ্রু নেমে এলো। ফুঁপানির অস্ফুট শব্দ শুনতে পেলাম। আমাকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। আমার মুখে গালে চুমো খেলেন। তারপর কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন–

'তুমি যদি শুধু আমার সন্তান হতে তোমাকে আমি কোথাও যেতে দিতাম না। কিন্তু তুমি মহান এক জাতির সন্তান। মুসলমান মেয়েরা তাদের সন্তানদের নিজেদের অধিকারভুক্ত কোন সম্পত্তি মনে করে না। তাদের সন্তানরা তো আল্লাহ তাআলার আমানত... যা বেটা! আল্লাহর দরবারে আমি আমার সন্তানকে সোপর্দ করছি।'

চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের অশ্রু আমি আড়াল করতে পারলাম না। বাবাও ধরা গলায় আমার মাকে বললেন–

'কোন পুলিশ এসে ওর কথা জিজ্ঞেস করলে তুমি কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। আর বলবে আমার ছেলে পালিয়ে গেছে।'

বাবার সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। শহর থেকে বের হলাম লুকিয়ে ছাপিয়ে। শহর থেকে মাইল খানেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে এক লোক দুটি উট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তিনি ছিলেন আমার বাবার কোন এক সহযোদ্ধা। একটি উটে বাবা ও আমি

সওয়ার হলাম। আরেক উটে সে লোক সওয়ার হলো। তারপর আমরা সেই মনযিলের দিকে রওয়ানা হলাম আজ যেদিকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

মাঝ রাতের পর আমরা এমন এলাকায় পৌঁছলাম যেখানে মাটি ও বালির উঁচু উঁচু বেশ কিছু টিলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু টিলা মোটা স্তম্ভের মতো চৌকোণা। কিছু মোটা দেয়ালের মতো। আবার অনেকগুলোর আকৃতি এমন যেন প্রাচীন কোন মহলের ধ্বংসাবশেষ। উট এগুলোর মাঝখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে, ঘন ঘন মোড় বদল করে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সেখানে দুটো ল্যাম্প জ্বলছে। অনেকগুলো মানুষ বসে গল্প গুজব করছে।

আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এক লোক আমার হাতে কুরআন শরীফ দিয়ে এই শপথ নিলো–

'আমি মহান আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে কসম করছি, আমার মাতৃভূমি আলজাযায়েরের জন্য কোন ধরনের আত্মত্যাগ থেকে পিছপা হবো না। হোক এই ত্যাগ আমার প্রাণের।... আর আমি এই পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে কসম করছি যে, আমি শত্রুদের অত্যাচারের চাপে কোন তথ্য ফাঁস করবো না। কয়েদী হলে সব রকম কষ্ট নির্যাতন সহ্য করবো; কিন্তু নিজের সঙ্গীদের কোন সন্ধান দেবো না।

এ ছিলো এমন এক অঙ্গীকার যা আমার বয়সের চেয়ে আমাকে আরো পরিণত করে তুললো। আমি যে এক অফিসারের ছেলে ছিলাম। ফ্রান্সী স্কুলে লেখাপড়া করেছি এসব আমি ভুলে গেলাম। নিজের প্রতি আমি নিজে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠলাম।

দু'তিন দিন পর থেকে আমাকে দুশমনের গুপ্ত বাহিনীর ওপর হামলা করার ট্রেনিং দেয়া হতে থাকে এমনভাবে, যেমন বাঘ তার বাচ্চাকে শিকার ধরার টেনিং দিয়ে থাকে। ফ্রান্সীরা মরুর কোথাও কোথাও চৌকি বানিয়ে রেখেছে। যেগুলো মাটির দেয়াল ঘেরা ছোট ছোট কেল্লার মতো। আমরা সেগুলোর ওপর ফায়ার করতাম। ঐ সব চৌকিতে আমরা ফায়ারিং করতাম। চৌকিগুলোতে সৈন্যদের রেশনবাহী ট্রাক যেতো। আমরা ট্রাকে হামলা করে রসদ পৌঁছানোতে বিঘ্ন ঘটাতাম।

এ পর্যন্ত আমি বেশ কয়েকটি নৈশ হামলায় অংশ নিয়েছি। তিনবার ভিখিরীর বেশে মার সঙ্গে সাক্ষাত করে এসেছি। শহরে উপশহরে এবং গ্রামে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি থাকলেও আমাদের কেউ মারা গেলে আমরা শহীদদের তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছে পাঠাতাম না। মরু ভূমিতেই দাফন

করে দিতাম। কারণ, আত্মীয়স্বজনের কাছে লাশ পাঠালে ফ্রান্সী পুলিশ তাদেরকে হয়রানীর মধ্যে ফেলতো।

কয়েকটি গেরিলা যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি। একদিন গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর এলো, কিছু কয়েদীকে জেল থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েদীদের সবাই মুক্তিযোদ্ধা। কমপক্ষে তিনটি গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হবে কয়েদীদের। জেল থেকে গাড়িগুলো রওয়ানা হবে সন্ধ্যার আগে।

আমাদের লিডার সেই গাড়ির ওপর হামলা করার জন্য আমাকেও তালিকাভুক্ত করেছেন। জানতে পারলাম আমার বাবাও এই কমাণ্ডো দলে আছেন। তিনিই আমাকে দলে নিয়েছেন। পনের জনের ছোট একটি গেরিলা দল। যে পথ দিয়ে কয়েদী গাড়িগুলো যাবে তার দু'পাশে ছোট পাহাড়। কাছেই ছিলো দু'টি গ্রাম।

সময় মতোই আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেলাম। কমাণ্ডার আমাদেরকে পজিশনে বসিয়ে দিলো। এম্বুশের জন্য এলাকাটি দারুণ ছিলো। টিলার চড়াই উৎরাই এবং চূড়া খুব চমৎকার ছিলো লুকানোর জন্য। তবে গাছ ছিলো না একটাও। আমার বাবা আমাকে এমন পজিশনে বসিয়ে দিলেন যেখান থেকে সড়ক খুব নিকট থেকে দেখা যায়। আমার কাজ ছিলো, সামনের গাড়ির ড্রাইভারকে গুলি করা। গুলি লক্ষভ্রষ্ট হলে গাড়ির টায়ারে ফায়ার করতে হবে। আমার কাছে ছিলো দূরপাল্লার রাইফেল। অন্যদেরও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়ে গিয়েছিলো।

মরু অঞ্চলের এই সড়কটি টিলার ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেতো। পনের বিশ মিনিট পর দূর থেকে গুরু গম্ভীর গুঞ্জন শোনা গেলো। আওয়াজটি খুব দ্রুত কাছে চলে আসছে। এটা যুদ্ধ বিমানের আওয়াজ। দূর থেকে দেখা গেলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটা বোম্বার বিমান খুব নিচু দিয়ে আসছে। আমাদের কমাণ্ডারের চিৎকার শোনা গেলো– 'লুকিয়ে পড়ো।'

আমরা যে যেখানে ছিলাম উপযুক্ত আড়াল দিয়ে লুকিয়ে পড়লাম। বোম্বারটি এত নিচ দিয়ে উড়ে গেলো যে, আমরা রাইফেলের গুলিতে বিমানটি ফেলে দিতে পারতাম। বিমানটি আবার ফিরে এলো। তারপর আমাদের পজিশনের ওপর দিয়ে কয়েকবার চক্কর কেটে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে ফিরে গেলো। বিমানটি আসলে এসেছিলো কয়েদী গাড়িগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত কিনা তা দেখার জন্য। আমাদের জন্য এটা ছিলো দুঃসংবাদ। আমাদের নড়াচড়ার কারণে আমাদেরকে যদি দেখে ফেলে তাহলে সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইদানিং ফ্রান্সীদের চৌকিগুলোর ওপর মুক্তিযোদ্ধা– মুজাহিদদের হামলা এত বেড়ে গেছে যে ফ্রান্সীরা সৈন্যদের হেফাজতে যুদ্ধ বিমান ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে।

বিমান ফেলার মতো কোন অস্ত্র আমাদের ছিলো না। এ ক্ষেত্রে আমরা নিরস্ত্র ছিলাম। কিন্তু আমাদের অস্ত্র ছাড়াই লড়তে হবে। আমাদের কমাণ্ডার বলতেন, মুসলমান লড়াই করে ঈমানের জযবায়। আর এতো কুফর ও ইসলামের লড়াই।

আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে এক মাইল দূর পর্যন্ত সড়ক দেখা যায়। আমি সেদিক তাকিয়ে রইলাম। কয়েদীদের প্রথম গাড়িটি আমার নজরে পড়লো। টিলায় অবস্থিত আমাদের ঘাটি থেকে আমার বাবার চিৎকার শোনা গেলো, 'খবরদার ... গাড়ি অনেকগুলো।'

অর্থাৎ কয়েদীদের গাড়ির সংখ্যা বেশি। কয়েদী গাড়ি আমরা দেখলেই চিনতে পারতাম। এগুলো লোহার গ্রিল দেয়া থাকতো। এতে ফায়ার করার সময় আমাদের সাবধানে থাকতে হতো। না হয় কয়েদীদের গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা ছিলো।

'খবরদার ওপরে জঙ্গি বিমান'– আমাদের কমাণ্ডারের সতর্কবাণী শোনা গেলো। গাড়িগুলো কমপক্ষে ষাট মাইল স্পিডে আমাদের পজিশনের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলো। এর মধ্যে একটি বোম্বার গাড়িগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে গেলো। আমি সামনের গাড়ির ড্রাইভারকে টার্গেট করা শুরু করে দিলাম। একশ গজ দূরত্বে থাকতেই আমি ট্রিগারে আঙ্গুলের চাপ বাড়ালাম। গাড়ির স্ক্রীন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখলাম আমি। গাড়ি এগিয়ে গেলো। আমি ক্ষিপ্রগতিতে গুলি করে টায়ার দুটি ফাটিয়ে দিলাম। এর সঙ্গে সঙ্গেই আমার অন্য সঙ্গীরাও ফায়ারিং শুরু করে দিলো।

সামনের গাড়িটি হঠাৎ ডান দিকে ঘুরলো এবং উল্টে গেলো। গাড়িটি সড়কের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে পড়াতে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। কয়েদীদের গাড়ি শুধু দুটি। আর বাকী চারটি ছিলো গার্ডদের। গার্ডরা সংখ্যায় ছিলো আশি নব্বই জন। প্রত্যেকের কাছে মেশিনগান ছিলো। আর আমরা মাত্র পনের জন। উল্টানো গাড়িটি ছিলো গার্ডদের। গাড়ি উল্টাতেই ওপর থেকে আমাদের ষ্টেনগানগুলো গাড়ির ওপর গুলি বৃষ্টি শুরু করে দিলো। একজন গার্ডকেও উঠতে দিলো না।

অন্য গাড়ির গার্ডরা এবার জবাব দিতে লাগলো। পজিশন আমাদের সুবিধাজনক হলেও জঙ্গি বিমান আমাদের পজিশনের সুবিধা নিতে দিলো না।

[illegible] হয়তো ওয়ার্লেস দিয়ে বিমানের পাইলটকে জানিয়ে দিয়েছিলো তারা আক্রান্ত হয়েছে। বোমার বিমানটি গোত্তা খেয়ে আমাদের পজিশনের কাছাকাছি এসে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে গেলো। বিমান এসেছিলো দুটি। দুটোই কোন বিরতি না দিয়ে ফায়ার করে গেলো। আমাদের মনোযোগ তখন ছিলো নিচের দিকে। কিন্তু বোম্বারের বার বার ফায়ারের কারণে আমাদের পজিশন দুর্বল হয়ে গেলো। বিমান আসলেই আমরা লুকিয়ে পড়তাম। এই সুযোগে পুলিশরা সুবিধাজনক পজিশন বেছে নিতে পারতো। এ ভাবে অনেক ফ্রান্সী পুলিশ টিলার ভেতর ঢুকে পড়লো।

আমি আমার পজিশন পাল্টে একটু ওপরে চলে গেলাম। দুই টিলার মাঝখানে দুই ফ্রান্সীকে দেখতে পেলাম। আমার পজিশন ওদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো না। অস্তমিত সূর্যের ক্ষীণ আলোতেই ওদের একজনকে আমি চিনতে পারলাম। সে হলো মারকোনীর স্বামী সার্জেন্ট। তার হাতে স্টেনগান। টিলার গা ঘেষে আসছিলো। আমি সহজেই রাইফেল দিয়ে টার্গেট করতে পারলাম।

'আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না'– আচমকা মারকোনীর আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো– 'তুমি সত্য পথেই আছো। তাই তোমাকে আমি ধোঁকা দিতে চাই না।'

আমার আঙ্গুল রাইফেলের ট্রিগার থেকে সরে গেলো। মারকোনী সত্যিই আমাকে ধোঁকা দেয়নি। সে রাতে যদি ও' আমাকে আমাদের বাড়িতে পুলিশি রেডের কথা না জানাতো, তাহলে আমার বাবা ধরা পড়ে যেতেন। আমাদের বাড়ি থেকে একটি পিস্তল ও দুটি খঞ্জর উদ্ধারের অভিযোগে আমাকেও জেলের ভয়ংকর কারেন্ট সেলে নিয়ে ভরতো।

আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না, আমি কি মারকোনীকে বিধবা বানিয়ে দেবো, না তার অনুগ্রহের বদলা দেবো। সহসাই আমার মনে পড়ে গেলো আমার প্রিয় দেশবাসীর হতভাগা বিধবাদের কথা। যাদের স্বামীদেরকে ফ্রান্সীরা নির্বিচারে শহীদ করছে। অবশ্য আলজাযায়েরের প্রতিটি ঘরের প্রত্যেক বধূই বিধবা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।

আমরা আঙ্গুল ট্রিগারের ওপর চলে গেলো। আমি আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে ট্রিগার টিপে দিলাম। মারকোনীর স্বামী সার্জেন্ট তীরের মতো হয়ে গেলো। তারপর একদিকে পড়ে গেলো। দেরী না করে সার্জেন্টের সঙ্গীকেও আমি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলাম।

কয়েদীদেরকে আমরা ছাড়াতে না পারলেও ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন ফ্রান্সীকে মারতে পেরেছি। বাকিরা কয়েদীদের গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। বোম্বার বিমান চলে গিয়েছিলো। কিন্তু আবার উড়ে আসতে দেখা গেলো। তবে সাঝের আঁধার আমাদেরকে লুকিয়ে ফেললো। টার্গেট করার মতো কাউকে না পেয়ে বিমান চলে গেলো।

আমার পনের জন সঙ্গীর মধ্যে শহীদ হলো আট জন। কয়েকজন যখমী হলো। এর মধ্যে আমার বাবাও ছিলেন। রাতে আমরা লাশ উঠিয়ে আমাদের আস্তানায় ফিরে গেলাম। গনীমত হিসেবে ফ্রান্সীদের কিছু অস্ত্র আমরা পেলাম।

সাত আট দিন পর ভিখিরীর বেশে আমার মাকে দেখতে গেলাম, মা আমাকে জানালেন, মারকোনীর স্বামী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেছে। সে খুবই শোকাহত। মাকে জানালাম না যে মারকোনী আমার হাতেই বিধবা হয়েছে। মাকে বললাম, তিনি যেন যে কোন ছুতোয় মারকোনীকে এখানে নিয়ে আসেন।

কোন ছুতো বা বাহানা লাগলো না। আমার আমার কথা শুনতেই মারকোনী আমাদের বাড়িতে চলে এলো। মারকোনীকে আমি অন্য এক কামরায় নিয়ে গেলাম। মারকোনী খুবই বেদনাহত ছিলো। চোখ দুটি ছিলো ফোলা ফোলা।

'মারকোনী! আমি ওকে বললাম– আমার জাতির দেয়া দায়িত্ব আমি পালন করেছি। যার কারণে তুমি বিধবা হয়ে গেছো। তোমার স্বামী আমার গুলির নিশানা বনে গেলো। না ... কিছুই করার ছিলো না ... এছিলো আমার দেশের প্রতি দায়িত্ব বোধের প্রতিফলন। এখন আমি ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের ঋণ আদায় করতে চাই'– আমি আমার কাপড়ের ভেতরে লুকানো পিস্তলটি বের করলাম এবং সেটা মারকোনীর দিকে বাড়িয়ে দিলাম– 'এই নাও। তোমার স্বামীর খুনের বদলা নাও। তোমাকে আমি এজন্যাই ডেকেছি। তোমার অনুগ্রহের বদলা তো আমি দিতে পারবো না। অবশ্য আমার জানটা দিয়ে দিতে পারবো।

পিস্তল নিয়ে মারকোনী যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো। শূন্য চোখে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। মারকোনীর এ দৃষ্টির সামনে আমি যেন হতবাক হয়ে গেলাম। কতক্ষণ এ অবস্থায় রইলো মনে নেই। হঠাৎ মারকোনী আমার চুলির মুঠি ধরে ঝাকাতে লাগলো। কিছুক্ষণ এভাবে ঝাকিয়ে ছেড়ে দিলো। তারপর কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'হায় শামস্!– কাঁদতে কাঁদকে বললো মারকোনী– 'আমি কত বড় ত্যাগ স্বীকার করলাম আর তুমি? অবশ্য আমার ব্যাপার তো ব্যক্তিগত। আর তোমার? তোমার জাতীয় ব্যাপার, দেশের ব্যাপার।'

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, মারকোনী কি বলতে চায়।

'মারকোনী! তুমি কি বলছো, আমি বুঝতে পারছি না'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'শামস! তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো, আমি আজ সত্য বলতেই এখানে এসেছি।' মারকোনী কান্নাসিক্ত কণ্ঠে বলে গেলো, 'শামস! তুমি আমার খেলার সাথী, স্কুলের সাথী, সুখে দুঃখে সবসময় আমরা পরস্পরের একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলাম। তোমাদের বাড়ির বারান্দা মনে হতো আমাদের। তোমারও হয়তো এমনই অনুভূতি ছিলো। এমন ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে দুটি ছেলে মেয়ে বড় হলো তাদের মধ্যে কি হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক আরো পাকাপোক্ত হয় না। অর্থাৎ, বুঝার মতো বয়স হবার পর অনুভব করলাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি ...

'তুমিও কি আমাকে ভালোবাসনি? তুমি মুসলমান আমি খ্রিস্টান। ধর্মের দেয়ালের এ বাঁধা আমার কাছে তেমন কিছু ছিলো না। তোমাকে নিয়ে যখন স্বপ্ন দেখা শুরু করি তখনোই সিদ্ধান্ত নিই, যে কোন সময় আমি মুসলমান হয়ে তোমার ঘরে চলে আসবো ...।

'কিন্তু বিধি বাম।' তোমার আব্বা এর মধ্যে বিদ্রোহী হিসেবে ধরা পড়ে গেলেন। তার পর হলেন ফেরারী। এর পরই তোমাদের বাড়ি রেইড হলো। আমার স্বামী সার্জেন্ট ডোনাল্ড তোমাকে গ্রেফতার করার সব রকম প্রমাণাদি নিয়েই এসেছিলো। আমার বাবাও আমার তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে সেদিন তাকে নিরস্ত্র করা গেলেও তার আসল মিশন কিন্তু ছিলো তোমাকে গ্রেফতার ...।

'তুমি নিশ্চয় ডোনাল্ডকে আমাদের বাড়িতে যেতে দেখেছিলে। সে তোমার প্রতি আমার মনোভাব বুঝতে পারে এবং আমাকে একা পেয়ে বলে, 'কোন মেয়ে এমন ছেলেকে ভালোবাসতে পারে? যে নাকি এক দেশদ্রোহীর ছেলে, ঐ ছেলে নিজেও দেশদ্রোহী। সবরকম প্রমাণ আমার হাতে দিয়েই তাকে গ্রেফতার করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। তোমরা যতই ছাফাই গাওনা কেন জাত সাপ আমরা চিনি। তাকে গ্রেফতার করা মানেই হলো, মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া ... তবে আমি তাকে বাঁচাতে পারি এক শর্তে।'

'বলুন কী শর্ত?' আমি বলে উঠি।

'আমাকে বিয়ে করতে হবে, না হলে তোমার বাবাকেও বিদ্রোহী হিসেবে জেলে পুরা হবে এবং তোমাকে এখন জোর করে আমি বিয়ে করবো।'

'সত্যি বিশ্বাস করো শামস্!' মারকোনী আবার ফুপিয়ে উঠলো– 'আমার রাজি হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। ডোনাল্ডের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হওয়ার বিনিময়ে যদি তোমাকে ও বাবাকে বাঁচানো যায় তাহলে বিয়েই তো আমার শেষ ও তোমাদের বাঁচার পথ। কিন্তু ডোনাল্ড আমাকে সত্যিই ভালো বেসেছিলো। প্রথম দিকে ওকে আমি ঘৃণাই করতাম। ওর নিখাদ ভালোবাসার কারণে আমি ক্রমেই ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম ...।

'শামস! আমি সেটাই বলছিলাম। তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমি আমার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতে পারলাম। আর তুমি আমার বিধবা হওয়ার কথাটাও চিন্তা করতে পারলে না!' 'মারকোনী! আমি বললাম– 'তুমি জানো, যুদ্ধের ময়দানে পিতা পুত্রও যদি মুখোমুখি হয় তখন আর পিতা পুত্রের সম্পর্কের কথা মনে থাকে না বা থাকতে নেই। যদি সেই সম্পর্ক বা সূত্র বড় হয়ে দাঁড়ায় তখন সে হয় তার স্বজাতির সঙ্গে বেইমানী করা এক মুনাফিক'।...

'হ্যাঁ, আমি জানি শামস্! তোমার করার কিছুই ছিলো না।'

এ সময় আমার মা কামরার ভেতরে ঢুকে মারকোনীকে জড়িয়ে ধরলেন। মারকোনী মায়ের কাধে মাথা রেখে ফুঁপাতে লাগলো।

'মা! আমি শুনেছি তোমরা যা বলছিলে– "আমার মা বললেন, তুমি যদি আমাকে আপন মনে করে থাকো তাহলে তোমাকে আমি একটা পরামর্শ দেবো।'

'জি খালাম্মা বলুন আপনার পরামর্শ আমি মেনে নেবো'– মারকোনী বললো।

'তাহলো মা তোমার মনে যেহেতু একবার মুসলমান হওয়ার বাসনা জেগেছিলো তাই সেই কল্যাণময়, বাসনাটি পূরণ করে ফেলো। মনে রেখো, শামসের সঙ্গে তোমার ভালোবাসা উপলক্ষ ছিলো, কিন্তু তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তোমার মধ্যে তার মহান মায়ের প্রতিচ্ছবি অংকিত করে দিয়েছেন। যে মা কওমের জন্য গর্বিত এক মা উপহার দেবে। ...

'মারকোনী মা! তোমাকে আমি বিধবা থাকতে দেবো না। তোমাকে শামসের বউ করে আমার ঘরে নিয়ে আসবো। তুমি শামসের সংগ্রামী জীবনের সহযোদ্ধা হতে রাজী?'

মারকোনী এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো। পরম আবেগে আবার মার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো।

# আমি মারকোনী নই, তাসমিয়া

আমরা ইতালীয় ক্যাথলিক হলেও ধর্মের ব্যাপারে আমাদের পরিবার খুব গোঁড়া ছিলো না। নিজ ধর্মের মতো অন্যসব ধর্মের প্রতি আমাদের সমান শ্রদ্ধা রয়েছে। এটার শিক্ষা দিয়েছিলেন আমার বাবা। মাও ছিলেন কোমল স্বভাবের। মা-বাবা দু'জনই মুসলমানদের প্রতি খানিকটা দুর্বল ছিলেন। দীর্ঘদিন মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের কারণেই হয়তো এ দুর্বলতা তৈরি হয়েছিলো।

এজন্য শামসদের সঙ্গেই যে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো তা নয়, আশেপাশের অনেক মুসলিম পরিবারের সঙ্গেও আমাদের সখ্যতা ছিলো। ইউরোপের অনেকগুলো দেশের মানুষ এখানে পাশাপাশি বসবাস করে। কিন্তু ওদের কারো সঙ্গেই আমাদের কারো তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। মুসলমানদের সঙ্গেই আমাদের উঠাবসা।

এন্য অন্যান্য ইউরোপিয়ানদের কেউ কেউ আমাদেরকে কে মুসলমান বলে মনে করতো। একদিন সকালে চার্চে গিয়েছি। চার্চে এমনিতে খুব একটা যাওয়া হয় না। মাসে দু'সালে একবার হয়তো যাওয়া হয়। তাও চার্চের শান্তিশিষ্ট পরিবেশটার কারণে। ওখানে গেলে মনটা কেমন পবিত্র হয়ে যায়।

চার্চে তখন লোকজন প্রায় একেবারেই ছিল না। শুধু একজন প্রৌঢ় লোক। তার সঙ্গে তার মেয়ে। ওরা মেক্সিকান। মেয়েটিকে আমি চিনি দূর থেকে। কিন্তু কথা হয়নি কোনদিন। আমি চার্চে ঢুকতেই মেয়েটি এগিয়ে এলো। ছিপছিপে গড়নের বেশ সুন্দরী একটা মেয়ে। যেকোন পুরুষের জন্য দারুণ আকর্ষনীয় পাত্রী। আমার সামনে এসে হাই বলে তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

'আমি লিলিয়ান! এবং মেক্সিকান। উনি আমার বাবা। এখন উপাসনা করছেন।'

'আমি মারকোনি।' তোমাকে আমি চিনি এবং তিনি যে তোমার বাবা তাও জানি'।

'আমিও তোমাকে এবং তোমার মা বাবাকে চিনি। কিন্তু তোমার নাম

জানতাম না। শুনেছিলাম বোধহয় দু'একবার। কিন্তু মনে ছিলো না।'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু তোমার নাম শুনে তা মনে হচ্ছে তুমি মুসলমান নও... খ্রিস্টান'...,

'হ্যাঁ, আমরা ক্যাথলিক খ্রিস্টান। ইতালিয়ান। কেন মুসলমান ভেবেছিলে আমাকে?'

লিলয়ানের কথায় আমি বেশ মজা পেলাম। লিলিয়ানের নাম শুনেছি আমার স্কুলের বান্ধবীদের কাছে। ও নাকি রোজ রোজ এক একজন ছেলের সঙ্গে ডেটিং করে। কোন ছেলেকেই ওর মনে ধরে না। আর যে ছেলে একদিন ওর সঙ্গে ডেটিংয়ে যায় পরদিন আর সে ওর কাছে ধারে ঘেষে না। কিন্তু লেলিয়ানের মতো এমন রূপসী মেয়ের বেলায় এমন কথা কে বিশ্বাস করবে? ব্যাপারটা রহস্যজনকই লাগলো। আর এখন লিলিয়ানের কথা শুনে একটু বিস্মিতই হলাম। জিজ্ঞেস করলাম।

'তা আমার ব্যাপারে তোমার মনে এমন অদ্ভুত ভাবনা এলো কেন?'

'তোমরা তো মুসলিম কমিউনিটিতেই থাকো। তোমার মা বাবাকে ওদের সঙ্গেই বেশি দখো যায়। চার্চে বা গির্জায় আমি উনাদেরকে কখনো দেখিনি। আর তোমাকে আমি অনেক বার দেখেছি একটা ছেলের সঙ্গে। দারুণ দেখতে ছেলেটা! কি যেন নাম... রাখো রাখো মনে পড়ছে। অনেক কষ্ট করে নাম জোগাড় করেছি সেই ছেলের...হ্যাঁ, মনে পড়ছে... শামস্! ঠিক না?'

শামসের নামটা শুনতেই আমার ভেতরটা শিহরিত হয়ে উঠলো। আমার মুখটাও হয়তো লাল হয়ে উঠেছিলো। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম স্বাভাবিক থাকতে। সেটা লিলিয়ানের চোখ এড়ালো না।

'নামটা শুনেই অমন লজ্জা রাঙা হয়ে উঠলে?' বলতে গিয়ে লিলিয়ানের চোখে মুখে কৌতুক ফুটে উঠলো।

'না, না, ওরকম কিছুই না। কি বলছো এসব লিলিয়ান? আমরা এক সঙ্গে লেখাপড়া করি। পাশাপাশি পড়ি। এই তো এর চেয়ে বেশি কিছু না।' বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপো উঠলো।

'ওরকম কিছু তো আমি বলিনি মারকোনি!' আমি শুধু বলেছি এমন লজ্জা রাঙা হয়ে উঠলে কেন? ওতেই তুমি এতগুলো কথা বলে ফেললে। যে কেউ শুনলেই বুঝতো ওই ছেলেকে তুমি প্রচণ্ডরকম ভালোবাসো। কিন্তু তুমি কি মুসলমান ছেলে ছাড়া আর কোন ছেলে পেলে না? তোমাদের ইতালিয়ানদের মধ্যেই তো কত দারুণ দারুণ ছেলে আছে। তাছাড়া মুসলমানরা তো অন্য

ধর্মের লোকদেরকে বিধর্মী বলে। অন্য ধর্মের সবাই ওদের শত্রু। যুদ্ধ, লড়াই, দাঙ্গা, ফাসাদ করতেই ওরা ভালোবাসে'...।

'চুপ করো লিলিয়ান!' আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম অনেকটা উত্তেজিত কণ্ঠে, 'অনেক বলে ফেলেছো। মানুষ যেটা জানে না সেটাকেই শত্রু বা বৈরী মনে করে। মুসলমানদের ব্যাপারে জানো না বলেই এ ধরনের মন্তব্য করতে পারছো। মুসলমানরা অন্য ধর্মের লোকদেরকে কখনোই শত্রু মনে করে না। বরং আমরাই ওদেরকে অকারণে শত্রু মনে করি। বছরের পর বছর ধরে মুসলমানদের সঙ্গে আমরা বাস করে আসছি। কখনো কি ওদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি? শাম্‌স আমাকে বলেছে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার এক চমৎকার আদর্শ শিক্ষা দেয় তার অনুসারীদের।...

'এখন ফ্রান্সীরা অন্যায়ভাবে ওদেরকে ওদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে বলেই তো ওরা রুখে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া তো ওদের কিছু করারও ছিলো না। এজন্য কি ওদেরকে যুদ্ধবাজ-দাঙ্গাবাজ বলাটা উচিত হবে?'

'তুমি শামসের কথা বলেছো। হ্যাঁ, আমাদের ইতালিয়ান ক্যাথলিকদের মধ্যে অনেক সুদর্শন যুবক আছে। কিন্তু ওদের মধ্যে আর শামসের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। সেই শৈশব থেকে শামস আমার খেলার সঙ্গী। এক সঙ্গে আমরা একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ালেখা করি। এমনকি একই গাড়িতে করে আমরা দিনের পর দিন স্কুলে আসা যাওয়া করেছি। এভাবেই আমরা বড় হয়েছি। সবকিছু বুঝার মতো বয়সে পৌছেছি'।...

'কিন্তু আমি যে ওকে পছন্দ করি এ কথা কখনো ওকে আমি বলিনি এবং সেও আমাকে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলেনি। তবুও আমাদের মধ্যে যে একটা অব্যক্ত ভালো লাগার সম্পর্ক আছে সেটা আমরা বেশ অনুভব করতে পারি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কি জানো? ও আমাকে কখনো ইচ্ছে করে স্পর্শ করেনি। একটু ছুঁয়েও দেখেনি। অথচ তুমি যাদের কথা বলছো ওসব ছেলের সঙ্গে দু'ঘণ্টার পরিচয়েই তো শুধু সম্পর্ক নয়, অনেক কিছুই ঘটে যায়। খুব সহজেই ওরা মেয়েদের কুমারিত্ব হরণ করে নিতে পারে? এসব ছেলের সঙ্গে শামসের তুলনা?'

'সরি! মারকোনী! আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি। তুমি যা বলেছো তাই হয়তো ঠিক। আমি একদিন তোমার শামসকে কলেজের ক্যাম্পাসে একা পেয়ে ডেটিংয়ের অফার করেছিলাম। ও আমাকে এমন হেলা ফেলা করে প্রত্যাখ্যান করলো যে, আমি খুবই ইনসাল্টেড ফিল করলাম। অথচ এই প্রথম কোন ছেলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলো। সম্ভবতঃ সেই ক্ষোভেই তোমাকে ও ভাবে কথাগুলো বলেছি।'

❖❖❖❖❖

এ কথা শামস আমাকে বলেনি। এজন্য আমার তেমন খারাপও লাগলো না। কারণ, শামস এসব মেয়ে ঘটিত ব্যাপারগুলো যেমন অপছন্দ করে এসব নিয়ে আলোচনা করতেও অপছন্দ করে। অবশ্য লিলিয়ানের সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে সে ব্যাপারেও আমিও যে কিছু বলিনি! বলার চেষ্টা করলেই নিজে নিজে লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম। অবশ্য তেমন সময় সুযোগও আসেনি। এর সপ্তাহ খানেক পরই ওদের বাড়ি ফ্রান্সী পুলিশ রেড করে।

এরপরের ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে গেলো, আমি দিশেহারার মতো হয়ে গেলাম। আমার ওপর সার্জেন্ট ডোনাল্ডের চোখ পড়া, বিয়ের প্রস্তাব এবং বিয়ে করা কোন কিছুই যে শামসের চোখ এড়ায়নি এটা আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম। একারণে শামসের মনোকষ্ট আমাকে ক্ষত বিক্ষত করেছিলো। সত্যিই, শাস্‌স ও তার মা এবং আমার বাবার জীবন বাঁচানোর জন্য এ ছাড়া কোন বিকল্প পথ ছিলো না।

ডোনাল্ডকে আমি নরপশুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম। কিন্তু ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসতো। এ কারণেই হয়তো ওর প্রতি আমার ঘৃণার তীব্রতা কিছু কমে এসেছিলো।

এর মধ্যে একদিন খবর এলো, শামস ফ্রান্সীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। খবরটা দিলো ডোনাল্ড। শুনে মনে হচ্ছিলো, আমার স্বপ্নের অবশিষ্ট দুনিয়াটাও যেন ভেঙ্গে পড়েছে। আমি ডোনাল্ডকে চেপে ধরলাম, তোমার দ্বারা যেন ওর কোন ক্ষতি না হয়।

'মারকোনী! লক্ষ্মী! পাগলামি করো না। সে তো এখন আর তোমার কেউ নয়। ওকে নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন? যেকোন সময় ও ফ্রান্সীদের হাতে মারা পড়বে। এক সময় ওর কথাও তুমি ভুলে যাবে।'

'বিশ্বাস করো ডোনাল্ড! আমি হয়তো তোমাকে ভুলে যাবো। কিন্তু ওকে কখনো ভুলবো না।' আমি ক্ষেপাটে গলায় বললাম।

'শান্ত হও মারকোনী! এসব তুমি কি বলছো?'

'আমার একটা কথার জবাব দেবে?'

'অবশ্যই দেবো।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'তোমার কোন সন্দেহ আছে? পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তোমাকে।' বলতে বলতে ডোনাল্ড আমার সামনে হাটু মুড়ে বসলো।

'তাহলে আমি যা চাইবো তা আমাকে দেবে?'

'যা চাইবে সব দেবো। কি চাও তুমি?'

'শামসের জীবনের নিরাপত্তা। যে পর্যন্ত তুমি ওর দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত না হবে, তুমি ওকে বাগে পেলেও মারাবে না এবং গ্রেফতারও করবে না।'

ডোনাল্ডের চোখে মুখে একজন পরাজিত মানুষের বিষণ্ন ছায়া নেমে এলো। অনেকক্ষণ কিছুই বললো না। কংক্রিটের ছাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

'এর বিনিময়ে কি তুমি আমাকে ভালোবাসবে?' অনেক্ষণ পর ডোনাল্ড ভাঙ্গা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ।

'হ্যাঁ, ভালো না বাসলেও ঘৃণা করতে চেষ্টা করবো না। আর শোন, ভালোবাসার কোন বিনিময় হয় না।'

'ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো? ডোনাল্ড কাষ্ঠ হেসে বললো।

এরপর আর ডোনাল্ড বেশিক্ষণ রইলো না। চলে গেলো। ডিউটিতে ব্যস্ত থাকায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্লা দিন দিন ভারী হওয়ায় ডোনাল্ড একাধারে কয়েক দিন বাসায় ফিরলো না।

৬ষ্ঠ দিনের দিন রাতে নয়টার দিকে খবর এলো, ডোনাল্ড আলজাযায়েরের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সম্মুখ লড়াইয়ে নিহত হয়েছে। শুনে খুব খারাপ লাগলো। লোকটা আমাকে খুব ভালোবেসেছিলো। বিনিময়ে ওকে আমি ঘৃণা ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি। কেন জানি খুব কান্না এলো। কাঁদলাম অনেক্ষণ।

পরদিন শামসের বাসায় গিয়েও খালাম্মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না কান্না করলাম। তারপর খালাম্মা আম্মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই প্রস্তাবটি দিলেন। মুসলমান হওয়ার এবং শামসের...আর বলতে পারছি না। মনে পড়লে এখনো আমার দু'চোখ ভরে অশ্রু নেমে আসে।

শামসের আম্মু আমাকে মুসলমান হওয়ার দীক্ষা দিলেন। আমার চমৎকার একটি নামটি রাখলেন। তাসমিয়া। আমিএখন মারকোনী নই, তাসমিয়া।

আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না তখন। যদিও কাঙ্খিত ছিলো। শামসও প্রস্তুত ছিলো না। শামস্ বললো,

'আম্মু! মারকোনী মানে তাসমিয়া এখন ওদের বাসাতেই থাকুক'।

'হ্যাঁ, তাসমিয়া'! শামস আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমিএখন আমাদের ক্যাম্পে চলে যাচ্ছি। আশা করি তুমি বর্তমান অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করবে। মাঝে মধ্যে আম্মুকে এসে দেখে যেয়ো। যেদিন আলজাবায়ের স্বাধীণ করতে পারবো সেদিন তোমাকে তোমাদের ঘর থেকে তুলে আনবো। আল বিদা... আল বিদা তাসমিয়া'

এগার মাস পর। আলজাযায়ের স্বাধীন হলো। আলজাযায়েরের মুসলিম মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মাতৃভূমিকে দখলদার ফ্রান্সীদের কবল থেকে উদ্ধার করলো। মুক্তিযোদ্ধারা দারুণ খুশি। টিভিতে খণ্ড খণ্ড বিজয়-উৎসব এবং ছোট ছোট মিছিলের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। যুদ্ধের বিভিন্ন চিত্র দেখাচ্ছে। সেকি লোমহর্ষক দৃশ্য। দেখানো হচ্ছে লড়াকু বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, আহতদের এবং শহীদদের ছবিও।

মুক্তিযোদ্ধারা যার যার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে আপনজনদের কোলে। কিন্তু শাম্‌স ফিরে এলো না। ফিরে আসছে না। এক দিন দুই দিন সাত দিন। শাম্‌স আসছে না। কিছু বলতে পারছে না। শাম্‌সের আম্মু আর আমি মুক্তিযুদ্ধে ক্যাম্পগুলো চষে ফেললাম। হাসপাতাল, ক্লিনিক, কোনটাই বাদ গেলো না। কেউ বললো, শামস্ বেঁচে আছে, কেউ বললো, শামস অসাধারণ যুদ্ধ করেছে। দারুণ করিশমা দেখিয়েছে; কিন্তু সামান্য আহত হয়েছে।

সপ্তম দিনে শামসের মার চোখে পানি দেখলাম। এই প্রথম কাঁদতে দেখলাম তাকে। সেকি কান্না! বুক উজাড় করা কান্না। বুক খালি করে কাঁদলাম আমিও।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার দশ দিন পর ঘোষণা এলো, আজ টিভিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুরস্কৃত করার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

রাত নয়টায় অনুষ্ঠান শুরু হলো। একে একে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ অবদানের জন্য পদক দেয়া হলো। সব শেষে উপস্থাপক ঘোষণা দিলো,এখন বারজন বীরশ্রেষ্ঠকে স্বর্ণপদক দেয়া হবে। তিন নম্বরে ঘোষণা হলো শামসের নাম।

শামসের আম্মা আর আমি দু'জনই চমকে উঠলাম। দু'জনের দৃষ্টিতে দিশেহারা ভাব ফুটে উঠলো। অধীর প্রতীক্ষার জ্বালা দু'জনকেই যেন আগুন-অঙ্গার করে দিচ্ছিলো। অবশেষে মঞ্চ এলো। দৃঢ়-ঋজুভঙ্গিতে এক দীপ্তিমান পুরুষ। শাম্‌স। আমাদের শামস!! পদকটি হাতে নিয়ে শুধু বললো,

'আমার এই পদক উৎসর্গ করলাম আমার মাকে, আমার প্রিয় মারকোনিকে এবং হাজার হাজার মুক্তিকামী শহীদদেরকে।

মা ঝাপসা চোখে আমার দিকে তাকালেন। স্মিত হেসে বললেন,

'তাসমিয়া! তুমি কি এখনো মারকোনি?'

'না; খালাম্মা! আমি মারকোনী নই, আমি তাসমিয়া' আমি হেসে বললাম।

'তাহলে ও' এসে যে পর্যন্ত তোমাকে তাসমিয়া বলে না ডাকবে তুমি ওর কথার কোন জবাব দিবে না'; মা সকৌতুকে বললেন এবং পরম স্নেহে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

# বিজয় কত দূর

১৯২২ সাল। মারাকেশ তখন গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক রাষ্ট্র। এক দেশের গোলাম নয়। দুই দেশের গোলাম। মারাকেশের এক অংশের দখলদার স্পেনিশরা। অন্য অংশের দখলদার ফ্রান্সীরা। ফ্রান্সীদের দখলেই ছিলো বেশির ভাগ অংশ।

১৯২২ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। মারাকেশের স্পেনীয় এক এলাকায় এক সেনা ক্যাম্প ছিলো। ক্যাম্পে সৈন্যসংখ্যা ছিলো হাজারখানেক। স্পেনিশ জেনারেল সেলিষ্টার সেদিন ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। জেনারেলের আগমন উপলক্ষে পুরো ক্যাম্প জুড়ে সাজ সাজ রব। প্রত্যেক সৈনিক ও প্রতিটা জিনিস জেনারেলের সামনে পরিদর্শিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

জেনারেল সেসিষ্টার ক্যাম্প পরিদর্শন করছিলেন। আচমকা ক্যাম্পে চিৎকার চেচামেচি আর হৈ হৈ রোল উঠলো। মুহূর্তেই তা কেয়ামতের বিভীষিকার রূপ নিলো। আসলে ক্যাম্পে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। হামলাকারীরা হলো মারাকেশের মুজাহিদরা। সংখ্যায় তারা স্পেনিশ ফৌজের দশভাগের এক ভাগ। তাদের অস্ত্র হলো, লাঠি, তরবারি, বর্ষা ও খঞ্জর। এসব দিয়ে তারা এমন ফৌজের ওপর হামলা করলো যাদের কাছে আছে দূর পাল্লার রাইফেল, মেশিনগান, হাত বোমা, পিস্তল ও তোপ কামান।

মুজাহিদদের হামলা যেমন আচমকা ছিলো তেমনি ছিলো তীব্র আর অপ্রতিরোধ্য। এই হামলায় সবচেয়ে বড় যে হাতিয়ার ব্যবহৃত হচ্ছিলো সেটা হলো স্বাধীনতার তীব্র আকুতি ও মুক্তির দৃঢ় অঙ্গিকার। এই জযবা ও চেতনাদীপ্ত হামলা এতই শক্তিশালী ছিলো যে, অধিকাংশ স্পেনিশ সেনা অফিসার মারা গেলো বা যখমী হলো। অল্প কিছু পালাতে পারলো। সৈনিকদের মধ্যে দেড় দুইশ পালাতে পারলো। প্রায় সাতশ'র মতো মারাত্মকভাবে হলো আহত। বাকিরা সব মারা গেলো। মুজাহিদরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গনীমত হিসেবে পেলো। তারপর তাদের গোপন ক্যাম্পে ফিরে গেলো।

এ ছিলো মারাকেশের মুজাহিদদের প্রথম হামলা। তাদের নেতা ছিলো গুমনাম এক লোক। যে নাকি পরবর্তীতে সারা দুনিয়ায় বীর আবদুল করীম নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। ফ্রান্স ও স্পেনের ফৌজরা তার নাম শুনলে কেঁপে উঠতো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চার বছর পূর্বে নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাত দিয়ে ফ্রান্সী ফৌজ মারাকেশে প্রবেশ করে। ধোঁকা প্রতারণা আর ষড়যন্ত্র করে এবং ফৌজি শক্তি খাটিয়ে মারাকেশের বড় একটি অংশ দখল করে নেয়। স্পেনিশরাও এভাবে জবর দখল চাপিয়ে মারাকেশের কিছু অংশ দখল করে নেয়। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স আলজাযারের সঙ্গে মারাকেশকেও নয়া প্রদেশ বানিয়ে ফেলে। নিজেদের সেনা সংখ্যাও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করে সেখানে। এভাবে মারাকেশে তারা ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের উদ্বাস্তু লোকদের আমদানী করতে থাকে। আরেকদিকে স্পেনিশরাও সমান হারে স্পেনিশ নাগরিকদের মারাকেশে আবাদ করতে থাকে।

এই দুই জবরদখলকারী সাম্রাজ্যবাদীদের জাতাকলে পড়ে মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব হারাতে বসলো। তারা বেঁচে থাকার সব উপকরণ যেন মুসলমানদের জন্য হারাম করে দিলো। এই দুই অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী দেশের উদ্দেশ্য ছিলে একটাই। সেটা হলো, মারাকেশকে যেন বিশ্বের কেউ মুসলমান রাষ্ট্র বলতে না পারে।

ফ্রান্সের কমান্ডার ছিলেন জেনারেল লাইটে। যিনি ছিলেন বিশ্ব স্বীকৃত চালবাজ। তিনি মারাকেশের মুসলমানদের গোলাম বানানোর জন্য সেই পুরনো ফর্মুলাই কাজে লাগান যা ইংরেজরা উপমহাদেশে দখলের সময় আবিষ্কার করেছিলো। সে হলো, জেনারেল লাইটে মারাকেশের নেতৃস্থানীয় মুসলমান– যারা বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার প্রধান ছিলেন– তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ উস্কে দিলো এবং প্রত্যক্ষ শত্রুতার অবস্থা সৃষ্টি করে জাতিগত ঐক্য ধ্বংস করে দিলো। তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতাধর ছিলো তাদেরকে দিলো অঢেল সম্পদ। কাউকে কাউকে দেয়া হলো জায়গীর। আর সাধারণ লোকদের দু'বেলার রুটি খাওয়ার অধিকারও ছিনিয়ে নিলো।

এ অবস্থায় যেকোন দেশ-জাতি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য রুখে দাঁড়ায়। লড়াই করে। কিন্তু মারাকেশের বেলায় ঘটলো উল্টো ব্যাপার। মনে হচ্ছিলো, এদেশ থেকে স্বাধীনতার সামান্য অনুভূতিও মুছে গেছে। যেন গোলামির শিকলকে ফুলের মালা বলে গলায় ধারণ করে নিয়েছে।

জীবন্ত এক জাতি সত্বা সন্তানরা মরে যায় কিন্তু জাতির ঐতিহ্য কখনো মরে না। জীবন্ত থাকে জাতির অন্তর-সত্তা। যা কোন এক মানবের রূপ ধারণ করে জেগে উঠে।

জেগে উঠলো মারাকেশের অন্তরসত্তাও। আবদুল করীম আল খাত্তাবীর রূপ ধারণ করে জেগে উঠলো। যিনি স্বাধীনতার এক অদম্য শ্লোগান নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো। তার পিতা ওকে শিক্ষা দিয়েছিলো সর্বোচ্চ শিক্ষা। সেটা হলো আইনের শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও সম্মানজনক জীবিকার দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হলো না। কারণ তিনি ছিলেন মুসলমান।

আব্দুল করীমদের বাড়ি হলো মারাকেশের স্পেনীয় এলাকায়। আইনের কোন চাকুরি না পেলেও আবদুল করীম অন্য একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। স্পেনিশ আর্মির অফিসারদের ইংরেজির মাধ্যমে মারাকেশি ভাষা শিক্ষা দেয়া। কৈশোর থেকেই আব্দুল করীমের মধ্যে আযাদীর স্বাধীনতার সহজাত চেতনা ও উন্মত্ততা ও বিদেশী মুনিবদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিলো। যেটা তিনি কখনো চেপে রাখতে পারতেন না।

এক দিন স্পেনিশ আর্মি অফিসারদের পড়াচ্ছিলেন। ক্লাশে স্পেনিশ সেনাবাহিনী প্রধান স্লেষ্টারও ছিলেন। এক অফিসার আবদুল করীমের বেশ কয়েকিট প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেনি বলে আব্দুল করীম তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। জেনারেল স্লেষ্টার এটা সহ্য করতে পারলেন না। গোলাম হয়ে তার মুনিবদের ধমকে উঠবে? এত বড় স্পর্ধা?

'নিজেকে তুমি কর্মচারী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারবে না। ভদ্রতা নিয়ে কথা বলতে শিখে এসো'– জেনারেল স্লেষ্টার যেন চাবুক মারলেন।

আব্দুল করীম মোটেও বিচলিত হলেন না। তার চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেলো। চোখে তীব্র চাহনি দিয়ে প্রথমে জেনারেলকে আঘার্ত করলেন আব্দুল করীম। তারপর উল্টো চাবুক ছুড়লেন–

'এর চেয়ে অসভ্যতা আর কি হতে পারে যে, তুমি তোমার শিক্ষককে ধমকাচ্ছো'?

জেনারেল স্লেষ্টার তখন অকথ্য ভাষায় তাকে গালাগাল করলো। আব্দুল করীম তাকে বললেন–

'স্পেনীয় অফিসাররা শুনে রাখো, মারাকেশ মুসলমানদের দেশ। তোমাদের নয়। একদিন না একদিন তোমাদের এখান থেকে পালাতে হবে'– আবদুল করীম

এই বলে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন– 'আমি তোমাদের এই চাকরির ওপর অভিশাপ দিচ্ছি।'

আব্দুল করীম ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না। জেনারেলকে তিনি যে কথা বলেছিলেন সেটা ছিলো বিদ্রোহের নামান্তর। আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে বের হতেই তাকে গ্রেফতার করা হলো এবং মামলা ছাড়াই জেলখানায় বন্দি করা হলো।

গ্রেফতারির মাত্র বিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। সকাল বেলা জেলখানার অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করা হলো, আব্দুল করীম গত রাতে ফেরার হয়ে গেছেন।

আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি, আবদুল করীম জেলখানার ওই দুর্ভেদ্য প্রাচীর কি করে অতিক্রম করলো। কর্তব্যরত প্রহরী ও পুলিশদের ভয়ংকর শাস্তি দেয়া হলো। বহু জায়গায় তল্লাশি চালানো হলো। আব্দুল করীমের ছায়াও কেউ মাড়তে পারলো না। এমনকি তিনি কি করে জেলখানা থেকে ফেরার হলেন তাও বহু তদন্ত করে বের করতে পারলো না। কারণ, সেই জেলখানা থেকে কোন কয়েদীর পালানো একেবারেই অসম্ভব ছিলো।

আব্দুল করীমের ব্যাপারে সংবাদ পাওয়া গেলো, এক পাহাড়ি এলাকায় স্বাধীনতাকামীদের হেড কোয়ার্টার ও ট্রেনিং ক্যাম্প বানিয়েছেন। কিন্তু সে পাহাড়ি এলাকা কোনটা সেটা কেউ খুঁজে বের করতে পারলেন না।

আব্দুল করীম গোপন আন্দোলনের এমন চমৎকার নকশা তৈরী করলো যে, অল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য মুজাহিদ তার ঝাণ্ডা তলে সমবেত হয়। ফ্রান্সী ও স্পেনীয়দের অসহনীয় জুলুম নির্যাতন মুসলমানদের জেগে উঠতে বাধ্য করে। বিশেষ করে দুই দখলদার বাহিনীর ফৌজদের জনসাধারণের সঙ্গে ছিলো হিংস্র জানোয়ারের মতো আচরণ।

মারাকেশের মুজাহিদদের একটা দুর্বলতা ছিলো। সেটা হলো– তাদের কাছে অস্ত্রভাণ্ডার ছিলো না। অথচ একই সঙ্গে স্পেন ও ফ্রান্সীদের মতো দুই পরা শক্তির সঙ্গে তাদের লড়তে হচ্ছিলো। এদিকে ফ্রান্সীরা বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচার করে দিয়েছে, মারাকেশের আসল শাসন ক্ষমতা মারাকেশি মুসলমানদের হাতেই রয়েছে। ফ্রান্সী ফৌজ শুধু একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় মারাকেশের শাসন শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখার কাজে সহায়তা করছে। কারণ, বিপথগামী কিছু বেদুইন গোত্র বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডার জবাব দেয়ার মতো কোন কিছুই ছিলো না মারাকেশিদের হাতে। পুরো খ্রিস্ট জগতই তখন তাদের বিরুদ্ধে। ক্রুসেডে সালাহ উদ্দিন আইয়ুবির কাছে পরাজিত হওয়ার বদলা নিচ্ছিলো খ্রিস্ট জগত।

আব্দুল করীম তার সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধার দলে সব রকম বৈচিত্রই আনার চেষ্টা করছিলেন। তাই তিনি তার দলের মধ্য থেকে একদল গুপ্তচরও তৈরী করেন। এক বছরের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের এক সেনা বাহিনী দাঁড়িয়ে যায়। তবে অস্ত্রবিহীন বাহিনী। অস্ত্র সংগ্রহ তাই জরুরী ছিলো। যার একমাত্র মাধ্যম ছিলো ছোট ছোট ফৌজি চৌকিগুলোর ওপর নৈশ হামলা চালানো। আর এজন্য জানবায বাহিনীর প্রয়োজন ছিলো। মুজাহিদরা প্রস্তুত হয়ে গেলো জানবাযির জন্য।

এক গুপ্তচর আবদুল করীমকে সংবাদ দিলো, স্পেনিশ জেনারেল স্লেষ্টার অমুক দিন অমুক ক্যাম্প পরিদর্শনে যাচ্ছেন। সে ক্যাম্পে রয়েছে এক হাজার সৈন্য এবং সব ধরনের আধুনিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ।

এ ধরনের শক্তিশালী বাহিনীর ওপর দিনের বেলা হামলা করা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আব্দুল করীম জেনারেল স্লেষ্টারের নাম শুনতেই তার রক্তের মধ্যে বিপুল আলোড়ন অনুভব করলেন। তার ভেতর জ্বলে উঠলো প্রতিশোধের আগুন। সেই তো আব্দুল করীমকে অন্যায়ভাবে জেলে ভরে ছিলো। সব মুজাহিদকে এক জায়গায় একত্রিত করে ঘোষণা দিলেন, ক্যাম্পে এই জেনারেল থাকতে থাকতেই হামলা করতে হবে। আর এই জেনারেলকে মেরে ফেলতে পারলে স্পেনীয়দের পা উপড়ে যাবে।

মুজাহিদরা তো এই হুকুমেরই অপেক্ষায় ছিলো। জান কুরবান করা তো তাদের কাছে এখন বড় আগ্রহের এক মিশন। হামলার জন্য তৈরী হয়ে গেলো তারা। সংখ্যায় তারা অনেক কম ছিলো। তাদের ট্রেনিংই দেয়া হয়েছিলো এমনভাবে যে অল্প সংখ্যক সৈন্য অধিক সংখ্যক বাহিনীর ওপর হামলা করে পর্যুদস্ত করে দেবে।

নির্ধারিত দিনে জেনারেল স্লেষ্টার ফৌজি ক্যাম্পে পৌছলেন। ওদিকে আব্দুল করিমের নেতৃত্বে ছোট একটা মুজাহিদ দল ক্যাম্পের কাছাকাছি এমন এক জায়গায় অবস্থান নিলো যেখানে কেউ তাদের দেখার কথা নয়। জেনারেল এসে মাত্র পরিদর্শন শুরু করেছেন এসময় মুজাহিদরা তলোয়ার, বর্শা, খঞ্জর ও ভারি পাথর নিয়ে ক্যাম্পের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এমন আচমকা ও ক্ষিপ্র হামলায় স্পেনীরা দিশেহারা হয়ে উঠলো। তারা পাল্টা প্রতিরোধ করার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু মুজাহিদরা সামলে উঠার সে সুযোগ তাদেরকে দিলো না। আবদুল করীম জেনারেল স্লেষ্টারকে খুঁজছিলেন। জেনারেল তার অফিসার ও বডিগার্ডদের নিয়ে পালাতে চেষ্টা করছিলেন।

❖❖❖❖❖❖

আবদুল করীম তাকে দেখে ফেললেন, অফিসার ও বডি গার্ডদের বেষ্টনীতে রয়েছেন জেনারেল। তাদের মেশিনগানগুলো অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। মুজাহিদরাও যখমী ও শহীদ হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল করীমের গর্জনও শোনা যেতে লাগলো– 'আমি জেনারেল স্লেষ্টারকে জীবিত বা মৃত নিয়ে যেতে চাই।'

এ ছিলো বিস্ময়ে হতভম্ব হওয়ার মতো এক লড়াই। লাঠি তলোয়ার বর্ষা মোকাবেলা করছিলো স্টেনগান ও রিভলবারের। এক দিকে ছিলো অভিজ্ঞ সেনা দল ও সেনাদল থেকে বাছাই করা বডিগার্ডরা। আরেক দিকে ছিলো সৈনিকী অভিজ্ঞতাহীন মুজাহিদ দল। যাদের কাছে জযবা ও নারায়ে তাকবীর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। মুজাহিদ বাহিনী জযবাদীপ্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থাতেই জেনারেলের ফৌজি বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেললো। ইতিমধ্যে মুজাহিদদের হাতে মৃত স্পেনিদের অনেক অস্ত্রই উঠে এসেছে। সেগুলো দিয়েই তারা রক্ষি বাহিনীর ওপর হামলে পড়লো এবং হেফাজত বেষ্টনী ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলো।

একটু পর স্পেনীশদের প্রধান জেনারেল স্লেষ্টার আবদুল করীমের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জেনারেল প্রাণ ভয়ে কাঁপ ছিলেন। আব্দুল করীম প্রতিশোধের আগুনে উন্মত্ত হয়ে বললেন–

'আমি তোমাকে বলে ছিলাম না যে মারাকেশ মুসলমানদের? তোমাদেরকে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি জঙ্গি শক্তির নেশায় পড়ে আমাকে জেলে ছুড়ে মারতেও দ্বিধা করলে না।'

'শোন আব্দুল করীম, জেনারেল গলায় জোর দিয়ে বললেন– 'তোমরা স্বাধীনতার স্বাদ পাবে না কখনো। আর মনে রেখো, আমাকে হত্যার প্রতিশোধ সারা দেশের প্রতিটি মুসলমানের কাছ থেকে নেয়া হবে। কারণ, তোমাদের কাছে কোন শক্তি নেই।'

'আমাদের শক্তি হলো আমাদের আল্লাহ ও তার প্রতি আনীত ঈমান'। আব্দুল করীম নিজের বুকে চাপড় মেরে বললো– 'তোমাদের কল্পিত খোদার অস্তিত্ব যদি সত্যিই থেকে থাকে তাকে বলো আমার ও আমার মুজাহিদদের হাত থেকে তোমাকে জীবিত মুক্ত করে নিয়ে যেতে।'

জেনারেল স্লেষ্টার প্রথমে কিছু হুমকি দিলো। যখন দেখলো, এসব হুমকিকে তারা মশা মাছির সমানও পাত্তা দিচ্ছে না তখন কোটি কোটি টাকার লোভ

দেখালো। বন্ধুত্ব ও সান্ধির প্রস্তাব দিলো। ওয়াদা করলো মারাকেশ থেকে স্পেনিশ বাহিনীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু আব্দুল করীমের অনঢ় কণ্ঠ নির্দেশ দিলেন–

'হে মুজাহিদরা! মারাকেশের সেই অসংখ্য নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার প্রতিশোধ নাও, যারা এই কাফের রক্ত চেষ্টা পিশাচের হুকুমে নিহত হয়েছে।'

মুহূর্তের মধ্যে একই সঙ্গে কয়েকটি বর্শা ও তলোয়ার জেনারেলের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।

লড়াইয়ের ময়দান ততক্ষণে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। উপরন্তু সারা ক্যাম্পে যখন এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, তাদের জেনারেল মারা গেছে তখন তো স্পেনিশদের অবশিষ্ট মনোবলও ভেঙ্গে পড়লো। ক্যাম্পের চার দিকে রক্ত আর রক্ত। এ অবস্থা দেখে দুশমন হাতিয়ার ফেলে পালাতে শুরু করলো। অনেক সৈনিক পালাতে গিয়ে মারা পড়লো। যারা ক্যাম্পে রইলো তারা হলো ভীষণভাবে আহত। বাঁচতে পারলো তারাই যারা নিরাপদে পালাতে পারলো।

মুজাহিদরা বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও অন্যান্য রসদপত্র উঠাতে লাগলো। শহীদদের লাশেরও ব্যবস্থা করে ফেললো অল্প সময়ের মধ্যে। মুজাহিদদের বাহন ছিলো প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। ক্যাম্প থেকেই অনেক উট, গাধাও পেয়ে গেলো মুজাহিদরা। স্পেনিশ হেড কোয়ার্টারে এই সংবাদ পৌছার আগেই মুজাহিদরা নিজেদের গোপন ক্যাম্পে ফিরে গেলো। মুজাহিদদের চলে যাওয়ার পর স্পেনিশ ক্যাম্পে লাশ ও আহত সৈনিকরা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

স্পেনিশরা তাদের দখলকৃত মারাকেশের অংশে জায়গায় জায়গায় বহু ছোট বড় ফৌজি চৌকি বসায়। আবদুল করিমের মুজাহিদ বাহিনী সে সব চৌকিতে গিয়ে বেশ কয়েকবার এধরনের হুমকি সহ ঘোষণা দিলো–

'ঐ সাদা চামড়াওয়ালারা! হাতিয়ার দিয়ে দাও এবং আমাদের কাছে এসে আত্ম সমর্পণ করো। না হয় এখান থেকে একজনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না।'

প্রতি রাতেই কোন না কোন চৌকির আশেপাশে এধরনের ঘোষণা শোনা যেতে লাগলো। মরুর নিঃশব্দ রাতে এ ধরনের গর্জন স্পেনীয়দের কলজে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। মনে হতো এ কোন ভূত প্রেত বা অশারীরিক আওয়াজ। সহস্রাধিক সৈন্যের ক্যাম্পে মুজাহিদদের সফল আক্রমণ এবং

জেনারেল স্লেষ্টারের মতো প্রকাশনী এক জেনারেলের মৃত্যু স্পেনিশদের মধ্যে দারুণ আতংক সৃষ্টি করে।

এতে যে কাজটা হলো সেটা হলো, যে চৌকিতেই রাতে গিয়ে মুজাহিদরা হুমকি দিতো সে চৌকি সকাল পর্যন্ত খালি হয়ে যেতো। এভাবে বেশ কয়েকটি চৌকি খালি হয়ে গেলো। কিছু কিছু চৌকিতে মুজাহিদদের নৈশ হামলাও করতে হলো।

আব্দুল করিম এরপর মুজাহিদদের ফৌজি কায়দায় বিন্যাস করে সে ফৌজ নিয়ে রীতি মতো সামনে এগুতে লাগলেন। এখন তার হেড কোয়ার্টার 'রীফ' পাহাড় সারির কোন কন্দরে স্থানান্তর করা হয়েছে। এরপর আবদুল করিম মারাকেশের মীলীলা নামক বড় এক শহরের ওপর হামলা করলেন। এই শহরে ফ্রান্সী, স্পেনিশ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকজন মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক ছিলো। আব্দুল করীম শহর অবরোধ করলেন।

অবরোধ চলছে নির্বিঘ্নে। কোন ধরনের রক্তপাত হচ্ছে না কোথাও। তবে মুজাহিদরা প্রতিশোধ স্পৃহায় এধরনের মানসিকতা প্রকাশ করে বসলো যে, এই শহরের সমস্ত নাগরিককে হত্যা করে সব ধন-সম্পদ নিয়ে নেয়া হবে। তারপর সেগুলো মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ে কাজে লাগানো হবে।

'আমার দৃষ্টি শহরের ওপর শহর বাসীর ওপরো নয়'- আব্দুল করিম একদিন মুজাহিদদের বললেন- 'এটা ঠিক যে, এই কাফেরের দলই নিরপরাধ মুসলমানদের পাইকারী দরে হত্যা করেছে এবং নারীদের ইজ্জত নষ্ট করেছে যত্রতত্র। তারপরও আমি শহরবাসীর ওপর হাত উঠাবো না। নিরস্ত্র করা রক্তপাত করা মুজাহিদদের ব্যক্তিত্বের পরিপনন্থী কাজ।'

তারপরও মুজাহিদরা মাত্রাতিরিক্ত জযবাও আবেগী হয়ে যাচ্ছিলো। এটাই ছিলো প্রথম ঘটনা যেখানে মুজাহিদরা আবদুল করিমের আনুগত্যে শিথিলতা দেখায় এবং শহরবাসীদের হত্যার ব্যাপারে অনঢ় মনোভাব দেখাতে থাকে। আব্দুল করিম ভেবে দেখলেন, শহরে অনেক যুবতী মেয়ে আছে যারা মুজাহিদদের ঈমান দুর্বল করে দিতে পারে। তারপর আছে অঢেল ধন-সম্পদ যা তাদেরকে লোভাতুর করে পদস্খলন ঘটাতে পারে। অবরোধ বেশি দিন ধরে রাখলে মুজাহিদদের পক্ষে তা বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই আব্দুল করিম অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে তার ক্যাম্পে চলে গেলেন।

এই একটি ঘটনার মাধ্যমেই আব্দুল করিমের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ মেলে, যা অনেক ইউরোপীয়কে মুগ্ধ করে। এমনকি স্পেনিশ সেনাবাহিনীর

কালাইমাস নামক এক সার্জেন্টকেও তা দারুণভাবে আলোড়িত করে। কালাইমাস মূলত স্পেনীয় ছিলেননা। ইউরোপের অন্য এক রাষ্ট্রের লোক ছিলেন। তিনি এক দিন লুকিয়ে ছাপিয়ে ঐ পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছে গেলেন, যেখানে মুজাহিদদের ক্যাম্প রয়েছে। তাকে একা একা দিক ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে দেখে মুজাহিদরা তাকে গ্রেফতার করলো। গ্রেফতারকারী মুজাহিদরা নিশ্চিত ছিলো যে, এ লোক স্পেনিশ ফৌজের গুপ্তচর।

কিন্তু সার্জেন্ট কালাইমাস আমীরে মুজাহিদ আব্দুল করিমের সঙ্গে সাক্ষাতের মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। আর এও বললেন, তিনি মুজাহিদদের দলে যোগ দিয়ে স্পেনিশদের বিরুদ্ধে লড়তে চান। মুজাহিদরা তার কথা মোটেও বিশ্বাস করলো না। এখানে রীতি হলো, তাদের এলাকায় কোন গাদ্দার বা দুশমনের কোন গুপ্তচর নজরে পড়লে তাকে সেখানেই জীবন্ত দাফন করে দেয়া। ক্যাম্পের কমাণ্ডার থেকে অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন নেই।

সার্জেন্ট কালাইমাসও যেহেতু গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে এজন্য তার জন্য একটা গর্ত খোদাই করা হলো। মূল হেড কোয়ার্টার অর্থাৎ আব্দুল করিমের ক্যাম্প সেখান থেকে একটু দূরে ছিলো। ঘটনাক্রমে আব্দুল করিমের ক্যাম্পের এক লোক সেখানে কি এক কাজে এসে এ দৃশ্য দেখে ফেললো। সে সার্জেন্টের কথা শুনে তাকে আব্দুল করিমের কাছে নিয়ে যাওয়াটা জরুরী মনে করলো। ক্যাম্প কমাণ্ডারের কাছে সে একথা বললো–

'যদি এই লোক ইউরোপীয় গুপ্তচর হয়ে থাকে তাহলে তো তাকে ওখানেও শাস্তি দেয়া যাবে। আমীরুল মুজাহিদীনের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ইচ্ছের মধ্যে নিশ্চয় কোন বিষয়ও তো থাকতে পারে।'

সার্জেন্ট কালাইমাসকে আব্দুল করীমের সামনে উপস্থিত করা হলো। আব্দুল করিমের সঙ্গে সার্জেন্ট স্বাভাবিক আচরণ করলেন। নির্ভয়ে তিনি বললেন–

'সত্যি কথা বলতে কি আমাদের ফৌজ এখানকার মুসলমানদের ওপর যে জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে তা আমার ভেতর আশ্চর্য রকম এক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ছোট ছোট মুসলমান বাচ্চাদেরকে স্পেনীয় অফিসারদের ওখানে বেগার খাটতে দেখেছি। দেখেছি, ওদেরকে একটি রুটির বিনিময়ে কি যন্ত্রণাই দেয়া হয়। তবুও ওদের ক্ষুধার্তই থাকতে হয়। এসব আমি সহ্য করতে পারতাম না। আবার যাকে খুশি তাকেই সামান্য ছুতোয় গুলি করে মেরে ফেলতো। ছোট ছোট

নিষ্পাপ বাচ্চাদের ওপর, নিরপরাধ কিশোরীদের ওপর নোংরা ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো এক সঙ্গে কয়েকজন অফিসার। তারপর তাকে মেরে ফেলতো বা সে এমনিই মরে যেতো। আর ওরা তাদের ছিন্নভিন্ন লাশের পাশে বসে হো হো করে হাসতো ...

'মুসলমানদেরকে ওরা মানুষ মনে করে না। স্পেনীয়দের যে হিংস্রতা আমি দেখেছি সেটা আপনারা শুধু শুনেছেন। আমার দ্বারাও ওরা অনেক হিংস্র কর্মকাণ্ড করিয়েছে। এজন্য অনেক রাত আমার নির্ঘুম কাটতো। আমার বিবেক-মন আমাকে অভিশাপ দিচ্ছিলো ...

'অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম যে, যে ধর্ম তার পূজারীকেও মানুষকে ভালোবাসতে শেখায় না, মানবতার পথ দেখায় না সেটা সত্য ধর্ম হতে পারে না। আমি জানতে পেরেছি আপনারা নাকি মিসীলা থেকে এজন্য অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছেন যে, ওখানে আপনাদের মুজাহিদরা ইউরোপীয়দের পাইকারী দরে হত্যা করবে এমন আশংকা করছিলেন। আর আপনাদের ধর্মে এটা মহা পাপ। এটা শুনতেই আমি আমাদের ক্যাম্প থেকে পালিয়েছি ...।

'বহু কষ্টে জানতে পেরেছি আপনারা এ এলাকায় আছেন, আমি পায়দল এখানে পৌঁছেছি। আমার রক্ত মাংসও পাপে নিমজ্জিত, পাপের বিরাট এক বোঝা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। সেটা থেকে মুক্তির জন্য আমি এখানে এসেছি। আমাকে সেই আলো দেখান যা আমার অন্তরাত্মাকে আলোকিত করবে ...।

'আর যদি গুপ্তচর মনে করে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান তাহলে কমপক্ষে মুসলমান বানিয়ে আমাকে হত্যা করুন। যাতে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে এমনভাবে হাজির হতে পারি যে, আমি পাপ থেকে ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে যাওয়া একজন মানুষ। যে মানুষটি পাপ থেকে সত্যিকারের তাওবা করেছে।'

সার্জেন্ট কালাইমাসের কথায় বেশ প্রভাব ছিলো। কিন্তু আব্দুল করিমের মতো দূরদর্শী এক কমাণ্ডার এ ফয়সালা দিতে পারছিলো না যে, এ লোক গুপ্তচর নয়। তার জন্য তখনই কোন শাস্তি ফয়সালা করা হলো না। আব্দুল করিম তাকে নিজের সঙ্গে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য কয়েকটি তীক্ষ্ম চোখও তাকে অনুসরণ করে গেলো। যদি এ লোক গুপ্তচর না হয় তাহলে মুজাহিদরা এর মাধ্যমে দারুণভাবে উপকৃত হবে এবং অনেক মূল্যবান তথ্যও পাবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই এটা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, তিনি গুপ্তচর নন। স্পেনিশ ও ফ্রান্সী ফৌজের অনেক গোপন তথ্য ও ফৌজের প্রধান প্রধান যুদ্ধ কৌশলগুলো জানিয়ে দিলেন। তারপর তাকে মুজাহিদদের গোয়েন্দাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ এক পদাধিকার দেয়া হলো। চমৎকার কাজ দেখালেন তিনি।

কালাইমাস খুব হাস্যরসিকতা পছন্দ করতেন। ক্রমেই তিনি ক্যাম্পের সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তারপরই গ্রহণ করলেন ইসলাম। আব্দুল করিম তার কালাইমাস নাম পাল্টে রাখলেন হজ্জুল আয়মান।

তত দিনে মারাকেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বেশ কিছু গোত্র সরদার আবদুল করিমের মুক্তিযুদ্ধ দলে যোগ দিয়ে ফেলেছে। এক সরদার তার পুরো খান্দান নিয়ে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদসহ জিহাদে শরীক হয়ে গেলেন। সে সরদার আল আয়মানকে এতই পছন্দ করলেন যে, তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করলেন। আল আয়মানের সঙ্গে এই পরিবারের এমনই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো যে সে সরদার তার একমাত্র অতি রূপসী মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

স্পেনিশরা সার্জেন্ট কালাইমাসকে গ্রেফতার করতে সবরকম চেষ্টা চালায়। যখন তারা জানতে পারে, কালামইমাস মুসলমান হয়ে গেছে এবং এক গোত্র সরদারের মেয়েকে বিয়ে করেছে তখন জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে পুরস্কারও ঘোষণা করে। বেশ মোটা অংকের টাকা ও এক শ ভরি সোনা দেয়া হবে এই ঘোষণাও করে। কিন্তু কেউ তাকে পাকড়াও তো দূরের কথা তার খোঁজও তারা বের করতে পারেনি।

হজ্জুল আয়মান অল্প দিনের মধ্যেই আব্দুল করিমের ডান হাত হয়ে যান। ইতিমধ্যে আব্দুল করিমের নাম ইউরোপের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। বৃটিশরা গোপনে তার মিত্র হওয়ার প্রস্তাব পেশ করে। জার্মানীরা অস্ত্র সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আব্দুল করিম সেসব প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানতেন, যে, দেশই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিক না কেন এদের আসল উদ্দেশ্য হলো শুভাকাংখী সেজে ভূমিকাংখী হওয়া তারপর এদেশ দখল করা।

সারা দেশের মুজাহিদদের এক মাত্র হাতিয়ার হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়ী জযবা। মুজাহিদদের মধ্যে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে তাদের একটা তালিকা তৈরী করে ফেলা হলো। আব্দুল করিম তাদেরকে

গ্রেনেড, রাইফেল ও রিভলভার তৈরীর কারিগরী প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করলেন। দেখতে দেখতে দুর্গম পাহাড়ের বিভিন্ন গুহা অস্ত্র কারখানায় পরিণত হলো। অস্ত্র তৈরীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা মুজাহিদদের জন্য বেশ সুবিধা এনে দিলো। তবে মুজাহিদরা বেশিরভাগ যে অস্ত্রের ব্যবহার করতো সেগুলো স্পেনিশ ফৌজ থেকে *ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র।*

মুজাহিদদের মধ্যে কিছু এমন মেধাবী সদস্য ছিলো যারা লড়াইয়ের সময়ও অসম্ভব ক্ষিপ্র ও দুঃসাহসী ছিলো। লড়াইয়ের বাইরেও অলস সময় কাটানোর পক্ষে ছিলো না। তারা অস্ত্র তৈরীর কোন রকম প্রশিক্ষণ না নিয়েও অন্যদের দেখাদেখি নিজেদের ঘরে বসে অস্ত্র তৈরী করতে লাগলো। একমাত্র উদ্দেশ্য ভিন দেশের কারো কাছে যাতে হাত পাততে না হয়। সাহায্যের জন্য ছোট হতে না হয়। সাহায্য নেয়ার বিনিময়ে বিক্রি হতে না হয়। আব্দুল করিম মুজাহিদদেরকে বলতেন—

'যারা তোমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে বা তোমাদের মিত্র হতে চাইবে একদিন না একদিন তারা যে কোন উপায়ে যেকোন বাহানায় যেকোন রঙে এর বিনিময় আদায় করে নেবে। হতে পারে বিনিময়স্বরূপ তোমাদের অস্তিত্বের একমাত্র প্রতীক ঈমানী 'জযবাটাই ছিনিয়ে নেবে। তাই নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করো।'

আব্দুল করিমের এ কথাগুলো মুজাহিদদেরকে বেশ নাড়া দিলো। মাত্র চৌদ্দ বছরের কিশোর যোদ্ধা আফফান মুজাহিদদের যোগাযোগের সুবিধার জন্য টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করলো। মুজাহিদরা দুশমনের বিভিন্ন চৌকি ও ফৌজি কাফেলার ওপর হামলা করে অনেক কিছুই লাভ করে। এর মধ্যে অসংখ্য টেলিফোন সেট ইকুইপমেন্ট ও কেবলও ছিলো। প্রথমে তো এসব জিনিস মুজাহিদদের জন্য ছিলো অর্থহীন। কারণ, মুজাহিদরা এগুলোর ব্যবহার জানতো না।

তখন এক ইলেট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের দারুণ মেধাবী ছেলে আফফান এগুলো কাজে লাগায়। আব্দুল করিমের জানবায বাহিনীর অসংখ্য ক্যাম্পে টেলিফোন সুবিধা পৌঁছে দেয়া হয়। ক্যাবল, ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস মাটির নিচ দিয়ে ফিট করা হয়। মুজাহিদদের এজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। টেলিফোন সুবিধার কারণে যোগাযোগসহ হামলার সময় ক্ষণ ও দুশমনের গতিবিধি ইত্যাদি জানা মুজাহিদদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। শত্রুপক্ষও বিস্মিত হয়, মুজাহিদরা কি করে এত দ্রুত তাদের গতিবিধি সম্পর্কে জেনে যায়।

মুজাহিদদের হামলা ও নৈশ হামলা এত পরিমাণে বেড়ে গেলো যে, শহর থেকে দূরের স্পেনিশ ফৌজের চৌকিগুলো খালি হয়ে গেলো। এতে অধিকাংশ চৌকির সৈনিকরাই নিহত বা আহত হলো। শত্রুপক্ষের জন্য দূরদূরান্ত পর্যন্ত রসদ পৌঁছে দেয়ার পথ বন্ধ করে দিলো মুজাহিদরা। তাদের রসদের গাড়ি ও গাড়িসহ মালামাল মুজাহিদরা লুট করে নিতে লাগলো।

শহরের বাইরে যেমন স্পেনিশদের পা রাখার জায়গা ছিলো না শহরের ভেতরও তাদের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়লো। শহরের বিধর্মী নগরিকরাও মুজাহিদদের পক্ষ নিতে শুরু করে দিলো। শহরের লোকেরা স্পেনিশ ফৌজদেরকে সবরকম নাগরিক সহযোগিতা বন্ধ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সরকারি আইনের বিরুদ্ধাচরণও শুরু করে দিলো।

দেখতে দেখতে এক সময় অবস্থা এমন হলো যে, কার্যত স্পেনিশ শাসন-প্রক্রিয়া এক প্রকার অকেজো হয়ে গেলো। স্পেনিশদের রাজত্ব ছিলো নামমাত্র। কার্যত শাসন কার্য শুরু হয়ে গেলো মুজাহিদদের। সন্দেহ নেই,আসলে এটা ছিলো মুজাহিদদের বিজয়। যা অর্জন করতে গিয়ে তাদের বিশাল রক্ত নদী পাড়ি দিতে হয়েছে। হাজারো মুজাহিদকে জান কুরবানী দিতে হয়েছে। নৈশ হামলা চালাতে গিয়ে কত মুজাহিদ শহীদ হয়েছে। আরো কত হয়েছে যখমী। অঙ্গ বঞ্চিত হয়েছে আরো কত টগবগে মুজাহিদ।

মুজাহিদ দলে অল্প বয়স্ক কিশোর কিশোরীও ছিলো। তাদের কেউ ধরা পড়লে এমন ভয়ংকর শাস্তি দেয়া হতো যে, তা দেখে কয়েকজন স্পেনিশ সৈনিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফেরার পর তারা ফৌজি চাকরি তো ছাড়েই, তারপর নিজেদের খ্রিস্টান ধর্মও পরিত্যাগ করে। গ্রেফতারকৃতদের পরিবার পরিজনদেরকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। ঘরের শিশু বাচ্চাদেরকেও রেহাই দিতো না ওরা। তাদের শরীর থেকে এক এক ফোঁটা করে রক্ত বের করে তাদেরকে মারা হতো। সারা দেশের ধূলিকণার প্রতিটি ইঞ্চি মুজাহিদদের রক্তের রঞ্জিত হয়েছে। এর বিনিময়ে মারাকেশের হারানো অংশের কিছুটা হলেও মুজাহিদরা উদ্ধার করতে পেরেছে। অবশ্য এজন্য হাজার হাজার স্পেনিশ সৈনিকের হাড় গোড় মাটির সঙ্গে মেশাতে হয়েছে।

এখানে আব্দুল করিম কৌশলগত একটা ভুল করলেন। তার উচিত ছিলো মারাকেশের যতটুকু অংশ জয় করতে পেরেছেন সেখানে নিজেদের অবস্থান

সুসংহত করা। সঙ্গে সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের ও স্বাধীন জাতির অবকাঠামো ঠিক করে নিজেদের ভিত্তিভূমি আরো স্থায়ী করা উচিত ছিলো।

কিন্তু স্পেনিশদের পিছু হটা ও কোনঠাসা অবস্থা আব্দুল করিমের আত্মবিশ্বাস এত বাড়িয়ে দিলো যে, তিনি অনেক বাস্তব পদক্ষেপকে এড়িয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরাও আরো আবেগী হয়ে উঠলো। স্পেনিশদের চিন্তা বাদ রেখে ফ্রান্সী ফৌজের ওপর হামলা শুরু করে দিলো। এসব হামলার অধিকাংশই ছিলো নৈশ হামলার আকারে। যেগুলো ফ্রান্সী চৌকিগুলোর ওপর হচ্ছিলো। এই পদ্ধতিতেই মুজাহিদরা স্পেনিশদের বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলো।

ওদিকে ফ্রান্সী জেনারেল লাইটে স্পেনিশ বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিরোধ ও জবাবী হামলার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন আগ থেকেই। জেনারেল লাইটে জেনারেল স্লেষ্টারের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী জেনারেল ছিলো। তাই তিনি রণকৌশল আগ থেকেই সাজিয়ে রেখেছিলেন। তা ছাড়া ফ্রান্সী ফৌজের সংখ্যা, অস্ত্র শক্তি এবং দখলকৃত অংশও বেশি ছিলো। এর বিপরিতে মুজাহিদরদের সংখ্যা ছিলো অনেক কম, অস্ত্র-শস্ত্রসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদিও ছিলো হাতে গোনা।

এরপরও মুজাহিদদের গেরিলা অপারেশন এতখানি সফল ছিলো যে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ফ্রান্সীদের গভীর চিন্তায় পড়তে হলো। অনেক ফৌজি ক্যাম্প ও চৌকি তাদের হাত থেকে ছুটে গেলো। কয়েক জায়গায় সরাসরি লড়াই হলো। সামান্য সংখ্যক মুজাহিদদের সামনেও বিশাল বাহিনীর ফ্রান্সী ফৌজ টিকতে পারলো না। মুজাহিদদের চরম ক্রোধ আর নারায়ে তাকবীরের বজ্র হুংকারে সামনে ফ্রান্সীরা হতবিহবল হয়ে পড়লো।

তবে জেনারেল লাইটে আরেকটা চাল চালার চেষ্টা করলো। সেটা হলো সারাদেশের প্রভাবশালী মুসলিম গোত্র সরদারদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিলো। তাদেরকে বড় বড় উপহার উপঢৌকন ও জায়গীয় দিয়ে ফ্রান্সীদের ওয়াফাদার বানাতে চেষ্টা চালাতে লাগলো। কমপক্ষে ফ্রান্সীদের দলে না ভিড়লেও যেন সরদাররা মুজাহিদদের কোন রকম সহযোগিতা না করে। এটাও ফ্রান্সীদের জন্য কম স্বস্তিদায়ক বিষয় না। একদিন এক প্রভাবশালী গোত্রের সরদার তার গোত্রের সবাইকে এক সমাবেশে একত্রিত করে ভাষণ দিলো,

'বন্ধুরা আমার! দেশে স্বাধীনতা ও মুক্তির নামে যারা ফ্রান্সীদের সঙ্গে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করছে তারা আসলে ডাকাত-সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারী। তারা এদেশকে ধ্বংস করতে চায়। ফ্রান্সীরা আমাদের বন্ধু। তাই তোমাদের উচিত ফ্রান্সীদের সহযোগিতা করা। আর মুজাহিদদেরকে সব রকম সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করা। শুধু তাই নয়, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে ফ্রান্সীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐ মুজাহিদদের রুখতে হবে।'

পরদিনই সেই সরদারের লাশ পাওয়া গেলো পরিত্যক্ত একটি জলাশায়। লাশের দুই পা উরু থেকে কাটা ও বাহু এবং মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। এর পরপরই অন্যান্য সরদারের কাছে কংকালের উল্কিযুক্ত একটি করে খাম বন্ধ চিঠি পৌঁছালো। তাতে লেখা ছিলো–

'তোমরা তোমাদের এক বন্ধুর বিচারদশা নিশ্চয় দেখেছো। মনে রেখো সে জীবিত থাকতেই তার অঙ্গগুলো বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অবশ্য মাথা কাটা হয়েছে তার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার পর। বিশ্বাস করো, দেশের সঙ্গে যারা বেইমানী করবে তাদেরকে এর চেয়ে সহজ বিচার আমরা করতে পারবো না। বিশ্বাস না হলে একবার বেইমানী তো দূরের কথা বেইমানীর চিন্তা করে দেখো না। তোমাদের হৃদ কম্পন ও মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম চিন্তার ধরনও আমরা টের পেয়ে যাবো।'

ফ্রান্সীরা যখন এ হাল দেখলো তখন স্পেনিশদের কাছে এক মৈত্রেয় চুক্তির প্রস্তাব পাঠালো। তাতে বলা হলো,

'মারাকেশে আমাদের ও তোমাদের দখল বজায় রাখার একমাত্র পদ্ধতি হলো বিদ্রোহীদের ধ্বংস করা। এজন্য প্রয়োজন আমাদের পারস্পরিক ঐক্যভিত্তিক পদক্ষেপ। আমাদের ও তোমাদের সৈনিকরা এক পতাকাতলে লড়াই করবে।'

স্পেনিশদের জন্য এই প্রস্তাব ছিলো হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। পরাজয়ের তাজা ক্ষত শুকানোর জন্য এর চেয়ে ভালো কোন পদ্ধতি ছিলো না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দু'দেশের ফৌজের সম্মিলিত কার্যক্রম শুরু হয়ে গেলো। সেনা পরিচালনা আরো দক্ষ হওয়ার জন্য ফ্রান্সী জেনারেল লাইটেকে সরিয়ে মার্শাল পার্টীনকে জেনারেল করে মারাকেশে পাঠানো হলো। এই বৃদ্ধ মার্শাল ছিলেন যুদ্ধ কৌশলের উস্তাদ। স্পেনও মার্শাল প্রাইমোদীকে জেনারেল

করে মারাকেশ পাঠালো। তারা উভয়ে মিলে সম্মিলিত এক হাই কমাণ্ড স্থাপন করলেন।

উভয় দেশের সৈনিকদের এক ছাউনিতে নিয়ে আসা হলো। উভয় দেশই আরো অতিরিক্ত সৈন্য পাঠালো। ফ্রান্স অতিরিক্ত যুদ্ধ বিমান ও কামান মারাকেশে পাঠালো। মুজাহিদদের জন্য কামান ও যুদ্ধ বিমান ছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর অস্ত্র।

মুজাহিদরা শত্রুপক্ষের যুদ্ধ কৌশল অনুযায়ি খোলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। গেরিলা ও কমাণ্ডো অপারেশন অব্যাহত রাখলো। এর মাধ্যমে ফ্রান্সীদের রসদ পৌছানোর ব্যবস্থাপনা অকেজো করে দিলো। দূর-দূরান্তের চৌকিগুলোতে মুজাহিদরা প্রয়োজনীয় রসদ পৌছাতে দিতো না। ফ্রান্সীরা এবার রসদের কাফেলার সঙ্গে ফৌজি কাফেলাও পাঠাতে লাগলো। মুজাহিদরা এতে দমলো না। তাদের ওপরও হামলা চালিয়ে গেলো মুজাহিদরা। এক এক হামলায় রক্তক্ষয়ী লড়াই হলো এবং শত্রু পক্ষের ক্ষতিও হলো অপূরণীয়।

অবস্থা বেগতিক দেখে ফ্রান্সীরা এবার নিজেদের রসদ হেফাজতের জন্য কাফেলার পেছন পেছন যুদ্ধ বিমান পাঠাতে শুরু করলো। এবার মুজাহিদরা কোণঠাসা হতে লাগলো। মরু অঞ্চলে বিমানের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজেদেরকে লুকানো অসম্ভব ছিলো। এই বিমান ব্যবস্থা দ্বারা ফ্রান্সীরা দূরদূরান্ত পর্যন্ত নিরাপদে রসদ পৌছে দেয়ার সুযোগ পেলো।

আবদুল করিম মুজাহিদদের হামলার পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনলেন। ফ্রান্সীরা তাদের প্রতিরক্ষা শক্তি অটুট রাখার জন্য ছোট বড় প্রায় ৬৬টি কেল্লা নির্মাণ করলো। আব্দুল করিমের মুজাহিদরা সেগুলোর ওপর হামলা শুরু করলো। ১৯২৪ সালের শেষ দিকে মুজাহিদরা নয়টি কেল্লা জয় করতে সক্ষম হলো। কিন্তু মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় সংকট ছিলো, তাদের লোকসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্রের অভাবও বোধ করতে লাগলো মুজাহিদরা। তাদের কাছে তো নির্ধারিত কোন অস্ত্র কারখানা ছিলো না।

ও দিকে শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা তৎপরতা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠলো। গ্রামে শহর উপশহর ও গ্রামে গুপ্তচররা ছড়িয়ে পড়লো। প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী লোকরা গ্রেফতার হতে লাগলো। কারো ওপর যদি সামান্য সন্দেহ হতো সে কোন মুজাহিদকে সহযোগিতা করেছে তাহলে তার পুরো খান্দানকে গ্রেফতার করে জেলের কালো কুঠরীতে নিক্ষেপ করা হতো।

ফ্রান্সীদের কোন কেল্লা মুজাহিদরা দখল করলেই সারাদেশের বিভিন্ন শহরের মুসলমানদের ঘর বাড়িতে সৈনিকরা চড়াও হতো। বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতো। তারপরও মুজাহিদদের মনোবল অটুট থাকতো। নিজেদের দুর্বলতাকে তারা জযবার দীপ্তি দিয়ে পূরণ করে দিতো।

আব্দুল করিম তার উদার মানবিক হৃদয়ের আরেকটি দুর্লভ নজির স্থাপন করলেন। মুজাহিদরা অনেক ফ্রান্সী ও স্পেনীয় সৈনিক গ্রেফতার করেছিলো। তারা ছিলো যুদ্ধবন্দী। আব্দুল করিমের হুকুমে তাদের সঙ্গে এত কোমল আচরণ করা হতো যে, মনে হতো তারা ভিনদেশী অতিথি। ১৯২৫ সালে যুদ্ধ বন্দি শত শত কয়দীকে আবদুল করীম ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, বড় বড় ট্রলারে করে তাদের সাগর পাড়ি দেয়ারও ব্যবস্থা করে দিলেন। বন্দিরা এই অপ্রত্যাশি মুক্তি পেয়ে বিস্মিত না হয়ে পারেনি। এজন্য অধিকাংশ বন্দিই মুসলমানদের এই আচরণে মুগ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে না গিয়ে মুজাহিদদের দলে যোগ দেয় এবং নিজেদের ফ্রান্সী বা স্পেনিশ সৈনিকদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯২৫ এর সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স ও স্পেনিশদের সম্মিলিত হাই কমাণ্ড মুজাহিদদের ওপর চূড়ান্ত এক হামলা চালায়। হামলায় তোপ, কামান ও যুদ্ধ বিমানের সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। ইতিহাসে একে এক অমানবিক হামলা বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

মুজাহিদদের মোর্চা ও ক্যাম্পের ওপর বিমান থেকে বৃষ্টির মতো বোম্বিং করা হয়। শহর ও আবাদীর কোথাও সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সেখানে কয়েক পশলা বোমা বর্ষণ হয়ে যেতো। হাজার হাজার ঘোড় সওয়ার সেই হামলায় শরীক ছিলো। মুজাহিদরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধ করার ও জবাবী হামলার চেষ্টা করে। এমনকি দুশমনদেরও ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কিন্তু শত্রু পক্ষকে তাদের পরিকল্পনা পাল্টাতে বাধ্য করতে পারলো না।

শত্রুপক্ষ এলো মেলো বোম্বিং অব্যাহত রাখলো। এমনকি ব্যবসায়িদের কোন কাফেলাও যদি পথে পড়েছে বোমার আঘাতে নিমিষেই পুরো কাফেলা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোন সাধারণ জনগণ এবং নিরপরাধ লোকদেরও ক্ষমা করা হলো না। মুজাহিদদের সংখ্যা কমে যেতে লাগলো খুব দ্রুত। ইমোনেশনও শেষ হয়ে গেলো। তারপর তারা তলোয়ার ও বর্ষা নিয়ে লড়তে লাগলো। কিন্তু

আগুন ও রক্তপাতের সেই তুফানের সামনে তারা মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে পারলো না।

মুজাহিদরা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে, দুশমনের হাতে নিজেদের জান নজরানা দিয়ে লড়ছিলো। কিন্তু এর শাস্তি পাচ্ছিলো শহরবাসীরা। তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছিলো কোন বাছবিচার না করেই। মুজাহিদদের পরাজয়ের সব লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। কোথাও থেকে তৎক্ষণাৎ কোন সাহায্য পাওয়ারও আশা ছিলো না।

আবদুল করিম শহরবাসীকে এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এ মর্মে শত্রু পক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু দখলদার বাহিনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলো। আবদুল করিমের কাছে সৈন্যসংখ্যা তখন একেবারেই হাতে গোনা। তারাও প্রায় নিরস্ত্র। অবশেষে ১৯২৬ এর এপ্রিল মাসে আব্দুল করিম ঘোষণা করলেন–

'মারাকেশের রক্তপাত একমাত্র আমার কারণেই হচ্ছে। আর রক্ত ঝরছে তাদেরই যারা লড়তে পারছে না। যারা লড়তে জানতো তারা তো লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গিয়েছে। তবে এক দিন না এক দিন মারাকেশ স্বাধীন হবেই। আমি না থাকলেও আরো অনেক আব্দুল করিমের জন্ম হবে।'

এই ঘোষণা দিয়ে তিনি ফ্রান্সী ও স্পেনিশদের গঠিত হাইকমাণ্ডের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বন্দীরূপে গ্রেফতার করা হলো। এবং তাকে তার পরিবারসহ জাযীরা ইউনিয়নের দুর্গম দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হলো।

কিন্তু আব্দুল করিমের নির্বাসনের কারণে তার অদম্য চেতনা-জাযবাকে কেউ নির্বাসন দিতে পারেনি। তার চেতনাদীপ্ত আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মারাকেশে আরো হাজার হাজার আবদুল করীমের জন্ম ঘটলো। তারপর ১৯৫৬ এর ৬ই মার্চ দখলদার দুই সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে মারাকেশ পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন হলো। আব্দুল করিম স্বাধীন মারাকেশে প্রবেশ করলেন স্বাধীনতার লাল গোলাপ হাতে নিয়ে।

# উড়ন্ত ঝাণ্ডা

১৯১৫ এর ১লা জানুয়ারী। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এমন এক ফৌজ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো যার নজির পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। কারণ, সে ফৌজের সদস্য ছিলো মাত্র দু'জন। তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিলো এরকম- ঝং ধরা দুটি রাইফেল। প্রায় দেড় রাউন্ড গুলি। তাদের একজন ছিলো, ঘোড়ায় চড়ে পথে ঘাটে ঘুরে আইসক্রিম বিক্রেতা প্রায় বৃদ্ধ এক লোক। তার নাম গুল মুহাম্মদ। আরেকজন হলো মোল্লা আব্দুল্লাহ। ত্রিশ বছরের নওজোয়ান।

তাদের ঝাণ্ডা ছিলো এরকম, এক লাল রঙের টেবিলক্লথের ওপর রঙ দিয়ে কয়েকটি তারকার ছবি একে দেয়া হয়। তুর্কিদের পতাকা এমন হয়।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ভিলেজের ছোট একটি জায়গা- ব্রকন হলের লোকেরা তাদের প্রতিবেশী দুই মুসলমান গুল মুহাম্মদ ও মোল্লা আব্দুল্লাহকে আফগান বলে জানতো। তখন অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ জায়গাতেই মরু অঞ্চল ছিলো। তাই সেখানে সাধারণ বাহন ছিলো উট। এসব হাজার হাজার উটের চালক ছিলো আফগানিস্তানের লোকেরা। ইংরেজরা তাদেরকে সেখানে নিয়ে যায়।

অনেক পরে প্রকাশ পায় যে, গুল মুহাম্মদ ও মোল্লা আব্দুল্লাহ তুর্কি। যারা নিজেদের মাতৃভূমির ক্ষেত্রে একেবারেই অন্ধ। বরং বলা যায় উন্মাদ দেশ প্রেমিক।

১৯১৪ সনে ইংরেজ ও তাদের মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে তুর্কিরা যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু ষাট বছরের গুল মোহাম্মদ সেটা ১৯১৫ এর ১লা জানুয়ারি শুনতে পায়, তুর্কিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে। আর অস্ট্রেলিয়া ইংরেজদের করদ রাজ্য।

গুল মুহাম্মদ এটা শুনেই জিহাদের জোশ জযবায় উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তার তুর্কি সঙ্গী মোল্লা আব্দুল্লাহর বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো। মোল্লা আব্দুল্লাহ ব্রকন হলে ধোপার কাজ করতো। ব্রকন হলে এ দু'জনেই তুর্কি ছিলো।

'শোন ভাই'- গুল মুহাম্মদ মোল্লা আব্দুল্লাহকে বললো, আমাদের 'প্রিয় তুর্কিস্তান ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে। এর অর্থ হলো, তুর্কিরা যেখানেই থাকুক তাদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর জানোই তো অস্ট্রেলিয়া ইংরেজদের দেশ। তাই এদেশের সবার বিরুদ্ধে আমরা জিহাদের ঘোষণা দিলাম।'

দু'জনে তখনই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা দুই যোদ্ধা বহু বছরের পুরনো রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যেগুলো তারা কোন কালে শখের বশে কিনেছিলো। তিনটি চামড়ার বেল্ট ছিলো তাদের কাছে। তিনটি চামড়ার বেল্টে তারা দেড়'শ রাইন্ড গুলি ভরে নিলো।

যুদ্ধের মাঠে অস্ত্র ছাড়াও আরেকটা জিনিসের প্রয়োজন হয়। সেটা হলো নিজ দেশের পতাকা। কাপড়ের টেবিলক্লথ নিয়ে তারা স্বহস্তে তারকাযুক্ত পতাকা বানিয়ে নিলো। সেটা বেঁধে নিলো একটা বাঁশের আগায়। ব্যস, ঝাণ্ডা তৈরী হয়ে গেলো। গুল মুহাম্মদ যে বাক্সে করে আইসক্রিম বিক্রি করতো সেটা বহনের জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি তৈরী করেছিলো সে। বাচ্চারা সে গাড়ি দেখলেই কিৎকার করে উঠতো খুশিতে। গুল মুহাম্মদের আইসক্রিম নিউ সাউথ ভিলেজে বেশ জনপ্রিয় ছিলো। সেই ঘোড়ার গাড়িতে করে গুল মুহাম্মদ ও মোল্লা আব্দুল্লাহ বেরিয়ে পড়লো।

যুদ্ধের ময়দানের জন্য যে জায়গাটা নির্বাচন করলো সেটা ছিলো শহর থেকে দুই মাইল দূরে। এলাকাটি গম্বুজ আকারের টিলা টক্করে ছাওয়া। সেখানে এই দুই তুর্কির প্রতিনিধিত্বকারী যোদ্ধা নিজেদের মোর্চা স্থাপন করলো। জায়গাটি এ্যাম্বুশের জন্য চমৎকার। কাছ দিয়ে একটি ব্রিটিশ অস্ট্রেলিয়া ট্রান্সশিপমেন্ট পরিচালিত রেললাইন চলে গেছে নিউ সাউথ ভিলেজের দিকে। একটু পরেই এখান দিয়ে একটি মেইল ট্রেন যাবে। তাতে অনেক ব্রিটিশ ইংরেজ থাকবে।

গুল মুহাম্মদ ও মোল্লা আব্দুল্লাহ শত্রুর আগমনের অপেক্ষায় সময় কাটাতে লাগলো। আধ ঘন্টা পর হুইসেল বাজিয়ে একটি মেইন ট্রেন এসে গেলো। এট্রেনটি ব্রিটিশদের। এতে অধিকাংশ যাত্রীই ইংলন্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিজেদের পরিবার নিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই নববর্ষের অবসর যাপনের জন্য বিভিন্ন জঙ্গলে ক্যাম্পিং এর জন্য যাচ্ছিলো। তরুণী মেয়েরা ও বাচ্চা ছেলে মেয়েরা হাসতে হাসতে গাইতে যাচ্ছিলো।

একটি কম্পার্টমেন্টের জানালা দিয়ে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে হাত তালি দিয়ে উঠলো। কারণ; তারা তাদের প্রিয় আইসক্রিমের গাড়িটি দেখে ফেলেছে। গুল মুহাম্মদ দেখলো বাচ্চাদের পেছনে তিন ইংরেজ দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন চলছিলো ধীরগতিতে। ঐ কম্পার্টমেন্টটি যেই গুল মুহাম্মদের রাইফেলের নল বরাবর এলো সঙ্গে সঙ্গে দুই তুর্কির রাইফেল গর্জে উঠলো। প্রথম দুই গুলিতে দাঁড়ানো দুই ইংরেজ মারা গেলো। পরের দুই গুলিতে এক ইংরেজ মাহিলা ও এক ইংরেজ যুবক মারা গেলো।

গুলি লেগে কয়েকটি জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেলো। এতে কয়েকটি বাচ্চাসহ বেশ কিছু যাত্রী আহত হলো। যাত্রীদের মধ্যে চিৎকার চেচামেচি শুরু হয়ে গেলো। আতংকে কয়েকজন যাত্রী চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লো। কেউ একজন ট্রেনের শিকল টেনে দেয়াতে ট্রেন থেমে পড়লো।

রেল লাইনের কাছে পিঠেই রেল কর্মীদের ব্যবহারের জন্য একটি স্টিলের টেলিফোন বক্স ছিলো। ইঞ্জিনের ফোরম্যান সেই বক্স খুলে পুলিশ স্টেশনে ফোন করলো। জানালো, অমুক স্থানে আচমকা ট্রেনের ওপর ফায়ারিং হচ্ছে। কয়েকজন যাত্রী মারা গেছে। অনেক আহত হয়েছে। পুলিশ ইনস্পেক্টর এডওয়ার্ড মিল্লার ফোনের কথাগুলো শুনে ভাবলেন, যে ফোন করেছে সে হয় কোন রসিক লোক। না হয় সে এক ড্রাম মদ খেয়ে টাল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ফোরম্যান যখন তাকে বললো, যেখান থেকে গুলি আসছে সেখানে একটি পতাকা উড়ছে। পাতাকাটির জমিন লাল এবং তাতে তারকা খচিত রয়েছে। আর সেখানে একটি আইসক্রিমের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। ইনস্পেক্টর এই ঘোড়া সমেত আইসক্রিমের গাড়ি চিনতেন এবং গাড়ির মালিক গুল মুহাম্মদকেও চিনতেন। তিনি বুঝে গেলেন, অস্ট্রেলিয়ায়ও বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে।

ইনস্পেক্টর এডওয়ার্ড মিল্লার লাফিয়ে উঠে তার অফিসের কাছেই অবস্থিত ফৌজি ক্যাম্পে গিয়ে জানালেন, এখান থেকে দুই মাইল দূরে কি ঘটছে। তাকে আশিজন ফৌজ দেয়া হলো। এই ফোর্সে তার অনেক কনস্টেবলও নিয়ে নিলেন। ফৌজ ও পুলিশের এই বিশাল দল তখনই পৌছে গেলো যুদ্ধের ময়দানে।

তুর্কিরা ততক্ষণে আগের পজিশন ছেড়ে আরো দূরের এক পাহাড়ে চলে গেছে। পাহাড়ের উঁচু এক জায়গায় স্থাপন করেছে তাদের পতাকা। তারা নিশ্চিত জানতো, পুলিশ বা ফৌজ অবশ্যই আসবে। তখনই শুরু হবে আসল যুদ্ধ। এজন্য তারা পাহাড়ের ওপর পজিশন নেয়াটাই নিরাপদ মনে করলো।

আর্মি ও পুলিশে গঠিত অস্ট্রেলিয়ান এই বাহিনী চাঁদ তারা খচিত পতাকা দেখেই সেদিকে ফায়ার করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলো। তারা এগুচ্ছিলো এমনভাবে যেন মজা করে চোর পুলিশ খেলছে। কিন্তু তুর্কিরা তাদের এই মজা মজা ভাব আর আনন্দ দূর করে দিলো। তাদের ফায়ারগুলো মিস হচ্ছিলো না একটিও। অস্ট্রেলিয়ানরা থেমে গেলো। তারপর এদিক ও দিক ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বা শুয়ে শুয়ে এগুতে লাগলো। কিন্তু দুই তুর্কি কয়েকজন সৈনিককে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলো। আরো কয়েকজন আহত হলো। গালি দিতে দিতে অন্যরা পিছু হটে এলো।

সরাসরি এই হামলা যখন ব্যর্থ হলো ইনস্পেক্টর এডওয়ার্ড মিল্লার তখন এক পাশ থেকে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার প্রধান কনস্টেবল জেক মিলাজকে নিয়ে তিনি তুর্কিদের পেছন দিক থেকে এগুতে শুরু করলেন। দু'জনই চাপা পায়ে এগুচ্ছিলো। দু'শ গজ যাওয়ার পর তুর্কিরা তাদের দেখে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে তিনবার ফায়ার হলো। একটি গুলি কনস্টেবল জেক মিলাজের পেটে গেঁথে গেলো। সে পেটে চেপে ধরে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগলো। আরেকটি গুলি এডওয়ার্ডে মিল্লারের উরু ছিড়ে বেরিয়ে গেলো। তার গলা দিয়ে গগণ বিদারী চিৎকার বেরিয়ে এলো। দু'জনে বড় কষ্টে গড়াতে গড়াতে পিছু হটে এলো।

ট্রেন আর সামনে বাড়লো না। যেখান থেকে এসেছিলো সেই ব্রকন হলে ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়লো, গুল মুহাম্মদ ও মোল্লা আবদুল্লাহ ট্রেনে গুলি চালিয়েছে। প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিলো না এই দুই সাধাসিধে 'আফগান' মুসলমান এধরনের ভয়াবহ কাজ করতে পারে। তারা বলতে লাগলো আমরা তো মোল্লা আবদুল্লাহর কাছ থেকে মাংস আনি। আর আমাদের ছেলে মেয়েরা গুল মুহাম্মদের আইস ক্রিমের জন্য পাগল। ভিনদেশী ও ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী এই দু'জন তো সেখানকার প্রতিটি ঘরেরই প্রিয়পাত্র ছিলো।

কিন্তু ট্রেন থেকে যখন তারা মৃতদের লাশ ও আহতদের স্ট্রেচারে করে নামাতে দেখলো তখন তো সবাই রাগে ক্রোধে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠলো। যাদের কাছে রাইফেল পিস্তল ছিলো তারা এই বলে ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়াতে লাগলো,

'শালার দুই মুসলে (মুসলমান)! তোমরা এত বড় বেইমান নিমক হারাম।'

প্রায় শতাধিক শহরবাসী সশস্ত্র হয়ে অস্ট্রেলিয়ান সেই বাহিনীর সঙ্গে যোগ

দিলো। সবাই মিলে তুর্কিদের ঘাটি ঘেরাও করে ফেললো। শহরের লোকেরা দাঁতে দাঁত পিষে পিষে বলতে লাগলো, গুল মুহাম্মদ ও মোল্লা আব্দুল্লাহকে যদি জীবিত পাওয়া যায় তাহলে দু'টোকে কিমা বানিয়ে ফেলা হবে।

কিন্তু কিমা বানানোর জন্যতো আগে ওদেরকে সশরীরে ধরতে হবে। সমস্যা ছিলো এখানেই। দুই তুর্কির ঘাটিতে দুইশ এরও অধিক রাইফেল চারদিক থেকে ফায়ার করছিলো অনবরত। যখন কারো মাথা তুর্কিদের চোখে পড়তো তখনই সেই মাথা লক্ষ্য করে ফায়ার হতো। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি ঢলে পড়তো বা গায়েব হয়ে যেতো।

তুর্কিরা এবার দেখে দেখে এবং টার্গেট ঠিক করে গুলি চালাচ্ছিলো। কতজনের ঘেরাওয়ের মধ্যে তারা রয়েছে সেটাও তারা আন্দাজ করতে পারছিলো না। তারা উঁচু আওয়াজে যুদ্ধ সংগীত গাইতে শুরু করলো। তারপর আরম্ভ করলো কুরআন তেলাওয়াত। তাদের আওয়াজ এত জোরালো ছিলো যে, পাহাড়ি এলাকার দূরদূরান্ত পর্যন্ত তা শোনা যাচ্ছিলো। মাঝে মধ্যে তারা শ্লোগানও দিতে লাগলো। নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার।

ওদের মাথার ওপর পতপত করে উড়ছিলো চাঁদ তারা খচিত তুর্কি ঝান্ডা।

মাস জানুয়ারি হলেও দুনিয়ার এ অংশে এখন গরম শুরু হয়ে গিয়েছে। অবরোধকারীরা ক্রমেই তুর্কিদের গলার স্বরে স্বতস্ফূর্ততার অভাব লক্ষ্য করতে লাগলো। সবাই বুঝতে পারলো, তুর্কিরা পিপাসার্ত হয়ে পড়ছে এবং তাদের কাছে পানি নেই। প্রথমে তো তাদের গলার স্বরে দারুণ তাজা ভাবছিলো। সূর্যের তাপ যতই বাড়তে লাগলো তাজাভাব ততই হ্রাস পেতে লাগলো। এখন তাদের স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা শুনাচ্ছিলো। কিন্তু তাদের রাইফেলের নল ছিলো তরতাজা। তাদের ছোড়া গুলিরও একটা নষ্ট হচ্ছিলো না, কেউ না কেউ নিহত বা আহত হচ্ছিলোই।

❖❖❖❖❖

অস্ট্রেলিয়ান বাহিনীর কেউ কেউ তুর্কিদের ঝান্ডাটির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলো– 'দেখো, গুলি লাগতে লাগতে পতাকাটির চারধার কেমন শতছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝখানে চাঁদ তারা অক্ষত আছে এবং বাতাসে পতপত করে উড়েই যাচ্ছে। ঝাণ্ডাধারী খুঁটিটাও অক্ষত।'

একটুপর এই দলের সঙ্গে সেনা সাহায্য স্বরূপ আরো কিছু সৈনিক যোগ দিলো। সশস্ত্র শহরবাসীও ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এখন তারা হামলার কৌশল পাল্টে দিলো। পঞ্চাশজন অভিজ্ঞ নিশানাধারী সৈনিককে আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে বলা হলো, তারা যেন তুর্কিদের ঘাটিতে অনবরত ফায়ার

করে যায়। যাতে ওরা মাথা উঠাতে না পারে। একশজনকে একত্রিত করে নির্দেশ দেয়া হলো, তারা ফায়ারও চালিয়ে যাবে এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তুর্কি ঘাটিতে পৌঁছতে চেষ্টা করবে। তারপর সব এক সঙ্গে হামলে পড়বে।

শুরু হয়ে গেলো এই অপারেশন। গুল মুহাম্মদ ও মোল্লা আবদুল্লার মোর্চার আশ পাশের এলাকায় গুলি বৃষ্টি হতে লাগলো। পাথরে গুলি লেগে চার দিক পাথর গুঁড়ায় ঝাপসা হয়ে উঠলো। তখন আর তুর্কিদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো না। ওদের ফায়ারও কমে এলো অনেকখানি।

অবশেষে একশজনের এই কমাণ্ডো দল দুই তুর্কির মোর্চার ওপর গিয়ে হামলে পড়লো। কিন্তু সেখানে জীবিত ছিলো শুধু মোল্লা আব্দুল্লাহ। গুল মুহাম্মদ শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। তার দেহে ছয়টি গুলি লেগেছিলো। প্রথমে একটি গুলি তার বাহুতে লাগার পর আরেক হাত দিয়েই ফায়ার চালিয়ে যাচ্ছিলো গুল মুহাম্মদ।

মোল্লা আব্দুল্লাহ ফায়ার করতে পারছিলো না। কারণ, একটি গুলি তার গালের চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে বের হয়ে গিয়েছে। আরেকটি গুলি তার খুপড়ির হাড় ভেঙ্গে বের হয়ে গেছে। তবে মাথার ভেতর দিক খতগ্রস্ত হয়নি। সেখান থেকে অঝোরধারায় রক্ত ঝরছিলো। তাকে ষ্ট্রেচারে করে পাহাড় থেকে নামানো হলো। আশংকা করা হচ্ছিলো লোকেরা তাকে দেখে তার ওপর হামলে পড়বে। কিন্তু তাকে দেখেই সমবেত জটলা দূরে সরে গেলো। তখন অনেকের চোখেমুখে বিস্ময়, মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার ঝলক দেখা যাচ্ছিলো। কয়েকজন বলে উঠলো–

'এদের মতো সত্যিকারের দেশ প্রেমিক বীর সাহসী আর কেউ কখনো দেখেনি এবং দেখবেও না হয়তো।'

মোল্লা আব্দুল্লাহ হাসপাতাল শুয়ে শুয়ে কোনক্রমে মাথা উঠালো। ভেঙ্গে যাওয়া চোয়াল নিয়েও প্রাণবন্ত আওয়াজে বলে উঠলো'

'আমরা নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমির সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে মারা যাচ্ছি। আহ! এটা যে কতটা গর্বের ... সম্মানের।'

এর কয়েক মিনিট পরই মোল্লা আব্দুল্লাহ শহীদ হয়ে গেলো। জড়িপ করে দেখা গেলো, অস্ট্রেলিয়ান বাহিনীর ৭৭ জন নিহত হয়েছে এবং শতাদিক আহত হয়েছে।

দুই তুর্কির ঝং ও মর্চে ধরা রাইফেল, গুলির তিনটি খালি বেষ্ট, আইস ক্রিমের বক্স এবং সহস্র ছিন্ন পতাকাটি আজও নিউ সাউথ ভিলেজ মিউজিয়ামের দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করে যাচ্ছে। যেন আজও পতপত করে উড়ছে তাদের ঝান্ডাটি।

# অলৌকিকতাকেও হার মানায়

লিপা্ উপত্যকা। সাড়ে নয় হাজার ফিট উচ্চতা তার। সাড়ে নয় হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের চূড়া সেটা। লিপা উপত্যকা নাম তার। কিয়ান উপত্যকাও বলা হয় একে। পাহাড়ের পাদদেশে এই নামেই একটি গ্রাম আছে। সৌন্দর্য মুগ্ধতা আর মনোলোভা দৃশ্যের অপার প্রদর্শনী এই উপত্যকা।

লিপা উপত্যকা আযাদ কাশ্মীরের 'করনাহ' উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে। এ উপত্যকা দৈর্ঘ্যে চৌদ্দ মাইল আর প্রস্থে আট মাইল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিট। আর পাহাড়ের উচ্চতা আট হাজার ফিট থেকে চৌদ্দ হাজার ফিটেরও অধিক।

ভৌগোলিক দিক থেকে এ উপত্যকার অবস্থান এরকম। উত্তর প্রান্তে রয়েছে চৌদ্দ হাজার ফিট উচু 'শামসবারী' রেঞ্জ নামক পাহাড়, যা সারা বছর বরফে আচ্ছাদিত থাকে। দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে সাড়ে বার হাজার ফিট উঁচু "কাযীনাগ পাহাড়। পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে দশ হাজার ফিট উঁচু পাঞ্জাল গালি , ভারতওয়ার গালি ও খন্ডায়াস্তাদাহ পাহাড়।

আকাশ ছোয়া এই পাহাড়গুলো লিপা উপত্যকাকে কেল্লার প্রাচীরের মতো ঘিরে রেখেছে। এই উপত্যকার অধিবাসীদের অধিকাংশই কিয়ানি বংশের মুসলমান। এ কারণে কিয়ান উপত্যকা হিসাবেই এ উপত্যকার পরিচিতি বেশী। যার কারণে এ উপত্যকা ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জল আছে। তিনি কর্নেল কিয়ানি শহীদ। তবে তিনি এই কিয়ান উপত্যকার কেউ নন। তিনি দূরের 'জাদ্দাহ' নামক এক অখ্যাত গ্রামের লোক।

বছরের প্রায় আট মাস পাঞ্জালগালি ও ভারতওয়ার গালি পর্বতের আশ পাশের জমি থেকে লোকেরা খানিকটা ফসল ঘরে তুলতে পারে। আর বাকী চার মাস পুরো এলাকা বরফে তলিয়ে যায়। লোকদের জীবন নির্বাহের পথ বন্ধ হয়ে

যায়। মানব জীবন এখানে নীরব - নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সেখানে কারো প্রাণচাঞ্চল্য থাকলে তা কেবল আযাদ কাশ্মীরের বীর সেনাদের থাকে। যারা এই বরফে ঢাকা দুনিয়ায় কেবল জীবনদীপ্ত থাকে না বরং তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তারা অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে পালন করে।

বরফে ডুবন্ত উপত্যকা ও পাহার চূড়ার উপর তাদের ঈগল দৃষ্টি সব সময় সচকিত থাকে। কারণ, শত্রুর কুদৃষ্টিও সব সময় আযাদ কাশ্মীরের এই উপত্যকা ও পর্বত চূড়ার ওপর আঠার মতো লেগে থাকে। দখলদার ভারতীয়রা শুরু থেকেই কিয়ান উপত্যকা দখলের নীল নকশা তৈরী করে যাচ্ছে। কারণ, এ উপত্যকার প্রতীরক্ষীয় ও ভৌগোলিক গুরুত্ব অনেক। রাবার ও কাঠ গাছের অভয়ারণ্য হওয়াতে বাণিজ্যিক গুরুত্বও কম না।

১৯৭০এর শেষ দিকের ঘটনা। ইসলামের শত্রুরা বিশাল শক্তি নিয়ে আক্রমণ করে এ উপত্যকায়। কিন্তু আযাদ কাশ্মীরের হাতে গোনা কিছু সৈন্য তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। শুধু তাই নয়, শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে শত্রুর দখলকৃত একটি এলাকা দখল করে নেয়। এলাকাটির নাম 'জম্মু বিলিজ'। ভারতীয় হিন্দু জঙ্গীদের আস্তানা ছিলো সেটা। জম্মু বিলিজ বেদখল হওয়াতে তাদের রসদ ও গোলা বারুদের সহজ সরবরাহ এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়।

এখন তাদের রসদ সংগ্রহ করতে হলে প্রায় চার-পাঁচ দিনের পথ ঘুরতে হবে। আর সে পথের প্রায় সবটাই হাজারো ফুট উঁচু বরফে মোড়া পাহাড় বাধার প্রাচীর হয়ে আছে। ওদের যোগাযোগের মাধ্যম টেলিফোনের তারও সে পথে গিয়েছে। সেটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা ও শত্রুদলের মধ্যে যখন গোলাগোলি শুরু হলো তখন জম্মু বিলিজ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটি ডিভিশন শত্রু পক্ষের প্রায় বেষ্টনির মধ্যে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধাদের সে পোষ্টে রসদ সরবরাহের পথ এমন দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেছে যা দুশমনের দখলে ছিলো। তবে সে পথের মধ্যবর্তী এক পথ দিয়ে চোরা একটি নদী যাচ্ছিলো। কৌশলে এই নদী পথে রেশন পৌছানো হচ্ছিল সেই শত্রু পরিবেষ্টিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। কিন্তু দুশমনের কাছে তাদের ক্যাম্পে রসদ পৌছানোর এমন বিকল্প কোন পথছিলো না।

১৯৭২ এর এপ্রিলের শুরুতে ভারতীয় শত্রু বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছে চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করলো, জম্মু বিলিজ থেকে তাদেরকে রসদ

সরবরাহের পথ ও টেলিফোনের তার স্থাপনের সুযোগ যেন দেওয়া হয়। এ যেন মামার বাড়ির আবদার। মুক্তি কমান্ডাররা এপ্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

৭২এরই ২৭ এপ্রিল ভারতীয় জঙ্গিবাহিনী গায়ের জোরে তাদের পছন্দ মতো এলাকা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করালো। জম্মু বিলিজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পোষ্ট 'গুরসী ডানা' ও 'গিড্ডী পাথার' এর ওপর প্রচন্ড গোলা বর্ষণ শুরো করলো। তারপর রীতিমতো যুদ্ধাংদেহী রণ কৌশলে হামলা শুরু করলো। পোষ্ট দুটিতে আযাদ কাশ্মীরের কেবল একটি করে প্লাটুন সৈন্য ডিউটিরত ছিলো। দুশমনের সংখ্যা ছিলো সে তুলনায় প্রায় তিনগুণ। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো আযাদ কাশ্মীরের এই পোষ্ট দুটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই হানাদারদের দখলে চলে যাবে।

কিন্তু মুক্তিকামী সেনারা এমন ঈমানদীপ্ত জযবায় জবাবী হামলা চালালো, দুশমন পিছু হটতে বাধ্য হলো। দুশমনের এ প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো তখন মুক্তিবাহিনীর সেই পোষ্টের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিলো। বীরুওয়ালী নাড়' সেই পোষ্টের নাম। অথচ যুদ্ধবন্দি চুক্তির সময় থেকে এপথ আযাদ কাশ্মীরের সীমানাভুক্ত। মূলতঃ বীরু ওয়ালী নাড় মুক্তি বাহিনীর দুর্বল একটি ক্যাম্প। কারণ, এর তিন দিকের উচ্চতায় শত্রুরা সবসময় মোর্চা বদ্ধ হয়ে থাকে। তিন দিকের শত্রু বাহিনীর তিনটি অতি শক্তিশালী ক্যাম্প রয়েছে। সে শক্তির দাপটেই বীরু নাড়ের সৈন্যদের রসদ সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে।

স্থানীয় কমান্ডাররা উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা কনফারেন্স করার সিদ্ধান্ত নিলো। শত্রুপক্ষ থেকে ৯নং শিখ রেজিমেন্ট থেকে এলেন কমান্ডিং অফিসার চাঙ্গাপা আর এদিক থেকে গেলেন কর্নেল হক নেওয়ায কিয়ানী।

শত্রু দলের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল চাঙ্গিয়া কনফারেন্সের শুরুতেই দাবী করলেন, তাদেরকে জম্মু বিলিজের রাস্তা দিয়ে দিতে হবে। তার এই দাবীর সুর অনুরোধের নয়, বরং স্পষ্ট হুমকির। কর্নেল হক নেওয়ায কিয়ানী চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দৃঢ়তায় তার দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। এই কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। দুই কর্নেলের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে একই বছরের ৩ মে।

দ্বিতীয় সাক্ষাতে কর্নেল চাঙ্গাপা কর্নেল হক কিয়ানী কে বললেন, আমাদের ব্রিগেড কমান্ডার বলেছেন, আযাদ কাশ্মীরের ফোর্স যেন 'বীরুওয়ালী নাড়' ক্যাম্পটি খালি করে দেয় অথবা জম্মু বিলিজের "গিড্ডীর পাথর' ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়। না হয় আমরা 'বীরু ওয়ালী নাড়' এর পথ খুলবো না।

কর্নেল হক নেওয়ায কিয়ানী অসম্ভব শীতল দৃষ্টি হেনে তাকালেন কর্নেল চাঙ্গাপা এর দিকে। চাঙ্গাপা সে দৃষ্টির সামনে যেন কেঁপে উঠলেন। তার সে দৃষ্টি

অন্যদিকে কিরিয়ে হক কিয়ানী বললেন, 'আমরা নিজেরাই রাস্তা খুলে নিবো'। একথা বলে কর্নেল কিয়ানী উঠে দাঁড়ালেন।

'তাহলে প্রথম গুলি আমাদের রাইফেল থেকে বের হবে না। কর্নেল চাঙ্গাহা দ্রুত হেসে বললেন।

কর্নেল এমন ভাব করলেন যেন তার কথা শুনতেই পাননি। বা শুনলেও কিছু এসে যায় না এতে। তিনি চলে গেলেন। তার সঙ্গে ছিলেন মেজর ইতশতিয়াক আহমদ ও মেজর ইয়ার আফজাল আফরিদী।

কর্নেল কিয়ানী তার অধীনস্ত অফিসারদেরকে, জোয়ানদের বেটা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি সেনা ক্যাম্পে ফিরে এসে মেজর ইশতিয়াক ও মেজর আফ্রিদীকে বললেন।

"দেখো বেটা! আমরা নিজেরাই আমাদের পথ খুলে নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ।" তার গলায় এমন দৃপ্ত উচ্চারন ছিলো যে। দুই মেজরও দারুণ সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠলেন।

রাতেই এগারটা পঞ্চান্ন মিনিটে শত্রুদল আযাদ কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ শুরু করলো। ভোর ৪ টার দিকে দুশমনে ৪নম্বর মহার রেজিমেন্ট আজ কাশ্মীরের বীরুওয়ালী নাড় এর ওপর এলোপাথাড়ি আক্রমণ শুরু করলো। এ ক্যাম্পটি আগ থেকেই শত্রুদলের ঘেরাও এর মধ্যে ছিলো। তার ওপর দুশমন কয়েক দিন থেকেই সে ক্যাম্পের রসদ সরবরহের রাস্তাও বন্ধ করে রেখেছিলো।

সে ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন জাভেদ আনওয়ার। যার কাছে রেশন তো ছিলোই না। ইমোনেশনও ছিলো সীমিত। তবুও তার উপস্থিত বুদ্ধি-কৌশল ও বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বে জোয়ানরা পাল্টা জবাব দিতে শুরো করলো।

শত্রুপক্ষ নিশ্চিত ছিলো ইমোনেশন খতম হলেই ক্যাপ্টেন জাবেদ আনওয়ার আত্মসমর্পণ করবেন বা ক্যাম্প ছেড়ে তার বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যাবেন।

অবস্থা দৃষ্টে তাই মনে হচ্ছিলো। কিন্তু আযাদ কাশ্মীরের এই যুবক ক্যাপ্টন ও তার মুষ্টিমেয় জোয়ানরা জানবাজি রেখে লড়তে লাগলো। কর্নেল হক নেওয়াজ কিয়ানী তৎক্ষনাতৎ জবাবী হামলার প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন। সেটা তার ব্রিগেড কমান্ডার আতা মুহাম্মদকে দেখালেন। ব্রিগেডিয়ার কমান্ডার ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল আবদুল মাজীদ মালিককে রিপোর্ট করলেন। তিনি তখন ছিলেন মীরি শহরে। মাত্র একদিন হয় তিনি সেখানে সিকড়ি থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

মেজর জেনারেল আবদুল মজীদ মালিক তখনই হেলিকপ্টার যোগে লিপা উপত্যকায় এসে পৌছলেন। হেলিকপ্টার অবতরণের পূর্বেই শত্রুপক্ষ ও মুক্তি বাহিনীর অবস্থান তিনি দেখে নিলেন। কর্নেল হক কিয়ানীর প্ল্যান তার সামনে রাখা হলো। অধিক চিন্তা ভাবনার সময় ছিলো না। দুশমনের অনবরত গুলি বর্ষণ ও আক্রমণের প্রচন্ডতা এমন তীব্র ছিলো যে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো, অবিলম্বে পাল্টা ব্যাবস্থা না নিলে পুরো উপত্যকায় শত্রুপক্ষ ছেয়ে যাবে। জেনারেল মজীদ মালিক কর্নেল কিয়ানীকে জবাবী হামলার অনুমতি দিয়ে দিলেন। হামলা শুরুর সময় ঠিক হলো রাত আড়াইটা।

'চক পাতরা' নামক এক পাহাড়ের ওপর হামলা করতে হবে। 'চক পাতরা' পাহাড়ের উচ্চতা সাড়ে নয় হাজার ফিট। এই সাড়ে নয় হাজার ফিট উচ্চতা অতিক্রম করে হামলা করতে হবে। আযাদ কাশ্মীরের ফোর্সের যুদ্ধ শক্তি বলতে ছিলো কেবল এক প্লাটুন সৈন্য। তাও বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় মোর্চাবিদ্ধ অবস্থায় বিক্ষিপ্ত তারা। চারটি মাত্র তোপ কামান ছিলো তাদের। যার গোলা বড় জোর মাত্র তিন মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। আর ছিলো ১২০ মিলি মিটারের দুটি মর্টার গান। এর বিপরীতে শত্রুপক্ষের ছিলো পুরো ব্রিগেড। আর এর সঙ্গে ছিলো পঁচানব্বই পাউন্ড গুলি। নয় মাইল রেঞ্জের ছয় মিডিয়াম তোপ। শত মাইল রেঞ্জের বারটি ফিল্ড তোপও বিশটি মর্টার গান।

আযাদ কাশ্মীরের মুক্তিকামী জোয়ানরা পাহাড় চড়তে শুরু করলো। তদের মাথার ওপর সাক্ষাৎ মৃত্যু দূত হয়ে দুশমন মোর্চাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছে। জোয়ানরা জায়গায় জায়গায় পুতে রাখা মাইনের মধ্য দিয়ে পথ করে অবিরাম পাহাড় জয় করার মতো এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা কোন ধরনের অঘটনে না পড়ে সঠিক সময়েই তাদের টার্গেটে পৌছে গেলো।

তারপর লড়াই শুরু হলো। প্রায় সম্মুখ সমর। এক অসম লড়াই। যার মধ্যে ঝলকিত হচ্ছিল ঈমাণদীপ্ত কারিশমা। কর্নেল হক নেওয়াজ কিয়ানী শহীদ এ লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেন। তিনি প্রমাণ করে দেন পবিত্র কুরআনের প্রতি পূর্ণ ঈমান থাকলে ঈমানের দৃঢ়তায় অনড় থাকলে সূরা আনফালের ভাষ্যমতে 'দুইশ কাফেরের ওপর বিশজন ঈমানদার বিজয় লাভ করতে পারে।'

কর্নেল হক কিয়ানী এমনিতেই 'মর্দে মুমিন' শব্দের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর সৈনিক ছিলেন। তার প্রকৃত অস্ত্র ছিলো পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনের সু-সংবাদের ওপর অবিমিশ্র বিশ্বাস পোষণ করতেন তিনি। লিপা উপত্যকায় হাজার হাজার ফিট উচ্চতার চেয়ে তার আবেগ,

চেতনা, বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব আরো উচ্চতর ছিলো। কাশ্মীর স্বাধীনতার আকাংখা তার রক্তের অণু পরমাণুতে মিশে গিয়েছিলো। তিনি প্রায়ই লিপা বা কিয়ান উপত্যকার সুউচ্চ চূড়া দেখিয়ে তার অফিসারদেরকে বলতেন।

'বেটা! যদি আমরা এই পাহাড় জয় করতে পারি তাহলে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত আদিগন্তের সেই পাহাড় প্রণালি আমাদের পদতলে চলে আসবে। তখন খুব সহজেই আমরা পরাধীন কাশ্মীরের কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করতে পারবো।'

তিনি নতুন অফিসারদেরকে এই বলে উৎসাহিত করতেন, 'বেটা! সবসময় এই চিন্তা ও পরিকল্পনা এবং জিজ্ঞাসা যেন তোমাদের মস্তিষ্কে সচল থাকে যে, "শ্রী নগর' জয় করতে তোমরা কোন পথ অবলম্বন করবে?

এভাবে তিনি নওজোয়ান অফিসারদের মন-মানসে পরাধীন কাশ্মীরকে স্বাধীন করার সংকল্প গেঁথে দিতেন। ১৯৬৫ এর যুদ্ধে শত্রুর দখলকৃত কাশ্মীরের দূর দূরান্ত পর্যন্ত অনেক কমান্ডো অপারেশনের নেতৃত্ব দেন এবং অবিশ্বাস্য বীরত্ব প্রদর্শন করে শত্রু পক্ষের কোমর ভেঙ্গে দেন। যার প্রতিদানে তিনি লাভ করেন "বীরশ্রেষ্ঠ' পদক।

লিপা উপত্যকায় সে রাতের হামলা সম্পর্কে তার ঐটা জানা ছিলো, সাধারণ রণকৌশল অবলম্বন করে হামলা চালালো কোন কাজ হবে না। কারণ, এ অবস্থায় হামলা করতে হলে অতিরিক্ত দু' প্লাটুন সৈন্য ও পুরো তোপখানা রেজিমেন্ট নিয়ে হামলা করা উচিত। না হয় "বীরুওয়ালী নাড় ' ক্যাম্প ও পুরো উপত্যকা শত্রুপক্ষের দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু কর্নেল হক কিয়ানী প্রতিটি পদক্ষেপে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। তিনি তার অফিসারদেরকে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা দিয়ে দিলেও জানতেন, এ লড়াইয়ে শেষভাগে জয়ের সম্ভাবনা একমাত্র শত্রু পক্ষের। কারণ তার দলের সৈন্য সংখ্যা যেমন কম তেমনি অস্ত্রশস্ত্রও অতি নগণ্য। অধিকন্তু, তাদের কাছে গরম পোষাকও নেই। খাকি উর্দি-ই তাদের শীত নিবারক বস্ত্র। তার ওপর সেনা সাহায্য পৌছারও কোন ব্যবস্থা এ অবস্থায় অন্তত নেই।

এজন্য জোয়ানদের মধ্যে ঈমানের উত্তপ্ত মশাল জ্বালিয়ে দেয়া জরুরী ছিলো। কর্নেল কিয়ানী অফিসার ও জোয়ানদের উপত্যকার এক জায়গায় দাঁড় করালেন। তারপর তাদের উদ্দেশ্যে ঈমান - তাজা কণ্ঠে বললেন,

'ছেলেরা আমার ! আজ রাতে তোমাদেরকে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হচ্ছে সে পরিস্থিতির সম্মুখীন তোমরা আর কখনো হওনি। তোমরা এতদিন

যেভাবে লড়াই করেছো এ লড়াই সে রকম নয়। আজ তোমরা সে দশমনের ওপর হামলা করতে যাচ্ছো যে দুশমনের শক্তি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। ওরা পাহাড়ের ওপর মোর্চাবদ্ধ - সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। আজ তোমাদেরকে সে লড়াই লড়তে হবে ইসলামের সূচনা লগ্নের মুজাহিদরা যে লড়াই লড়ে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। তোমাদেরকে আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাল্লামের স্বর্গীয় স্মৃতিকে তাজা করে তুলতে হবে। বিধর্মীরা আজ তোমাদের আত্মমর্যাদাকে চেলেঞ্জ করেছে। আজ রাতে তোমাদের বিজয় বা শাহাদাত। জাতি আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

তারপর কর্নেল কিয়ানী সবার উদ্দেশ্যে বললেন "আল্লাহর সিপাহীরা! মাথায় কাফনের কাপর বেঁধে লড়াই করো।' একথা বলে তিনি পাতলুনের পকেট থেকে একটি সাদা কাপড় বের করে সেটা মাথায় বাঁধলেন। তারপর বললেন,

'দেখে নাও সবাই, এটা আমার কাফনের কাপড়ের ওপরের অংশ। আমি এটা মাথায় বেঁধে নিলাম'।

কর্নেল কিয়ানী নিজের কাছে সবসময় কাফনের কাপড় রাখতেন। এর ওপর সুগন্ধি লাগিয়ে রাখতেন। কর্নেলের কথা শেষ হতেই এ হামলার অন্যতম কমান্ডার মেজর মুহাম্মদ সাবির খান এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে গেলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। তারপর সেটা মাথায় বেঁধে ফেললেন। বললেন ,

'আমার কাছে কাফনের কাপড় নেই। আজ রুমালকেই আমি কাফনের কাপড় মনে করছি।'

এদৃশ্য জোয়ানদের মধ্যে যেন অগ্নি শেলের উন্মত্ততা সৃষ্টি করলো। তারা আর এখন আর কোন সেনাবাহিনীর জোয়ান নয়। আল্লাহর জোতির্ময় জানবায সৈনিক।

আমি লিপা উপত্যকার সে জায়গা দেখে এসেছি যেখানে কর্নেল কিয়ানী তার জোয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তখনকার মুক্তিকামী কয়েকজন জোয়ানের সঙ্গে পরে আমার সাক্ষাৎ হয়।

কর্নেল কিয়ানী মাথায় কাফনের কাপড় বাঁধার সময় তাদের কি অনুভূতি হয়েছিলো সেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। এ প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জোয়ানের চেহারা আবেগে উজ্জল হয়ে উঠে। তারা বলেন।

'যখন আমাদের কর্নেল ও কোম্পানি কমান্ডার মাথায় কাফনের কাপড় বাঁধলেন তখন আমাদের মধ্যে এক অজানা শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটলো। আমরা

একেবারেই ভুলে গেলাম দুশমনের শক্তি কয়েক গুণ বেশি এবং ওরা দশ হাজার ফিট উচ্চতার দারুণ সুবিধায় রয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছিল দুশমন আমাদের পদতলে লুটিয়ে পড়েছে।'

সেই বীর জোয়ান আরো বললেন,

"কর্নেল কিয়ানী শহীদের এক ভবিষ্যৎ সুসংবাদ দানের কথা আজ মনে পড়ছে। তিনি কুরআন অন্তপ্রাণ ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি ফায়সালা পবিত্র কুরআনের আলোকে করতেন। তিনি সেদিন সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর জোয়ানদের এ সুসংবাদ দিলেন যে,

"তোমরা যে পথ দিয়ে পাহাড়ে চড়বে সে পথের প্রতি স্কয়ার ফিট জায়গায় দুশমন মাইন পিল্ড পুঁতে রেখেছে। আমি তোমাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, চলার সময় তোমাদের কারোরই পায়ের নিচে বা বুটের তলায় একটিও ফিল্ড মাইন বিস্ফোরিত হবে না। পবিত্র কুরআন থেকে আমি এই সুনিশ্চিত ইংগিত পেয়েছি। আরেকটি সু-সংবাদ শুনে নাও, দুশমন অন্ধ হয়ে যাবে। তোমাদের এই স্বল্প সংখ্যক সেনা ওদের চোখে দশগুণ হয়ে ধরা দিবে।'

হলোও তাই। জোয়নরা যখন রাতের গভীর অন্ধকারে নিঃশব্দে পাহাড় চড়ছিলো তখন তারা টেরও পেলো না বিধ্বংসী ফিল্ড মাইনের ওপর দিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। একজন জোয়ানও মাইন বিস্ফোরণে আহত হলো না। একটি মাইনও যদি বিস্ফোরিত হতো কোন জোয়ান কেবল আহত বা শহীদই হতো না। বরং সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হতো সেটাহলো মাইন বিস্ফোরণের বিকট শব্দে শত্রুপক্ষ সচকিত হয়ে উঠতো। তারপর তাদের গ্রেনেড আর মেশিনগানের গোলায় নিমিষেই খতম করে দিতো আযাদ কাশ্মীরের এই গুটি কয়েক মুক্তিযোদ্ধাকে।

এভাবে স্বাধীনতাকামী মুক্তি সেনারা শত্রুর একেবারে ঘাড়ের পেছনে গিয়ে পজিশন নিলো যমদূত হয়ে। তারপর যে লড়াই হলো সেটা প্রায় এক তরফা লাড়াই হলো। শিখ রেজিমেন্টের সৈন্যরা সামান্য প্রতিরোধেরও সময় পেলো না। হামলার আকস্মিকতায় শিখ সেনারা পালাতে শুরু করলো। যে মাইন ফিল্ড আযাদ কাশ্মীরের জোয়ানদের পায়ের তলায় অলৌকিকভাবে বিস্ফোরিত হয়নি সেগুলোই একের পর এক বিস্ফোরিত হয়ে শিখদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে লাগলো।

কর্নেল কিয়ানীর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য বলে প্রমাণিত হলো। দুশমন অন্ধের মতো পালাতে লাগলো। আযাদ কাশ্মীরের জোয়ানরা এমন ভয় ডরহীন দুঃসাহস নিয়ে জানবাযী রেখে হামলা চালালো যে, দুশমনের অতি মজবুত

শক্তিশালী বাংকারগুলো অল্প সময়েই দখল করে নিলো। অনেক শিখ অস্ত্র ফেলে আত্ম-সমর্পণ করলো। কিন্তু যারাই লড়তে চাইলো বা প্রতিরোধের চেষ্টা করলো তাদের বুক বা মাথা বুলেটের আঘাতে ঝাঝরা হয়ে গেলো।

বাংকারগুলো থেকে শিখদের পালানোর পর দেখা গেলো, প্রতিটি বাংকারে একাধিক মেয়ে রয়েছে। সব কটাই সুন্দরী যুবতী। এরা জানালো, কমান্ডিং অফিসাররা জোরপূর্বক এদেরকে ভোগ করার জন্য নিয়ে এসেছে। এরা শিখ রেজিমেন্টের রক্ষিতা। পরে এদের সবাইকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হলো। আযাদ কাশ্মীরের কোন জোয়ান তো দূরের কথা কোন অফিসারও এদের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

কর্নেল হক কিয়ানী তার দূরদর্শী রণকৌশলের আরেকটি অপার প্রদর্শনী দেখালেন। হামলার আগে যেখানে তিনি তার জোয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা পাহাড়ের এমন একটি প্রশস্ত কন্দর ছিলো যে, সব সময় সে জায়গাটা শত্রুপক্ষের আড়ালে পড়ে থাকতো। তাদের দৃষ্টিসীমায় সে স্থানটি ধরা পড়তো না।

ভাষন শেষ করার পর কর্নেল কিয়ানী জোয়ানদেরকে সারি বন্ধ করে খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে এমন পথ দিয়ে নদী পার করলেন যেখান থেকে দুশমন তাদেরকে দেখতে পেতো। কিন্তু এই সারিটি নদীর পারে গিয়ে দুশমনের দৃষ্টি থেকে সরে পড়তো এবং লুকানো অবস্থায় নদী পার হয়ে আবার এপারে চলে আসতো, এরপর আবার সারিবদ্ধ হয়ে দুশমনের দৃষ্টিসীমা দিয়ে নদী পার হতো। আবার গা ঢাকা দিয়ে এপারে এসে পুনরায় খোলা জায়গা দিয়ে নদী পার হতো। কর্নেল কিয়ানী এভাবে তার জোয়ানদেরকে কয়েকবার এপার ওপার করালেন। কিন্তু শত্রু বাহিনী ওপার থেকে দেখছিলো, আযাদ কাশ্মীরের জোয়ানদের সারির পথচলা যেন শেষই হচ্ছে না। এবং একের পর এক সেনা সারি নদী পার হচ্ছে। আর তাদের দৃষ্টিতে এ ছিলো পুরো ব্রিগেডের সৈন্য। আড়াই তিনশত জোয়ানকে কর্নেল এমন ভাবে নদী পার করালেন যে, তাদের দৃষ্টিতে তা আড়াই তিন হাজারে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

এই মুষ্টিমেয় জোয়ানরা যখন প্রায় দশ হাজার ফিট উচ্চতায় "চক পাতরা' পাহাড়ে হামলা চালালো তখন তারা রক্ত মাংসের মাত্র আড়াই তিনশ জোয়ান ছিলো না। তারা হয়ে গেলো একেকজন উৎক্ষিপ্ত আগুনের গোলা। আর এই আগুন ছিলো কুরআন ও ঈমানের। হামলার মধ্যে এমন প্রচন্ডতা ছিলো যে,

শত্রুপক্ষের এবিশ্বাস জন্মালো যে, এ কেবল একটি কোম্পানি না, বেশ কয়েকটি প্লাটুন তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। তাদেরকেই তারা সন্ধায় নদী অতিক্রম করতে দেখছিলো।

জোয়ানদের মধ্যে ঈমানের জাগ্রত শক্তি তো ছিলোই আর ছিলো কর্নেল কিয়ানীর সংকল্পবদ্ধ গভীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও ছিলো, কোন বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটলেও আল্লাহ তাআলা তাদের জেনারেল আব্দুল মজীদ সালিককে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনিও বসে থাকবেন না। কারণ, তিনিই নিজের প্রশাসনিক পদকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে এই বিপদজনক হামলার অনুমতি দিয়েছেন।

লড়াইয়ের একেবারে শেষ দিকে যখন শিখ রেজিমেন্টের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেছে তখন কর্নেল কিয়ানি শহীদ হয়ে যান। তার বিভিন্ন পত্রাবলি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই শাহাদাত বরণের সুসংবাদ তিনি আগেই পেয়েছিলেন। এই লড়াইয়ের আগে তিনি তার মা, তার ছেলে ও তার ভাইকে চিঠি লিখেন। তার মাকে তিনি লিখেন ,

প্রিয় শ্রদ্ধাস্পদ মা !

আসসালামু আলাইকুম

আশা করি আপনি সুস্থ আছেন। আমাদের এখানকার পরিস্থিতি অনেকটা ঘোলাটে। শিগগিরই এখানে লড়াই বেধে যাবে। অবশ্য এ নিয়ে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। আমরা তো আমাদের সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে রেখেছি। আল্লাহ তাআলা চাইলে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা আমাদের ও ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাবো। আমার নয়নের মনি মা ! আজ আমি আপনার দু'আর কাঙাল। আল্লাহ তাআলা আপনার জীবনকে সম্মানিত করুন। আল্লাহ তাআলা যদি এবার আমাকে কবুল করে নেন তাহলে আপনি শোকাহত হবেন না। এমন হলে নিশ্চিত জানবেন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এমনই ছিলো। সন্তানের কিছু হলে মা বাবার জন্য তো তা মেনে নেওয়া বড় কষ্টদায়ক হয়। কিন্তু এতে তো কারো হাত থাকে না। তবে এটা তো নিশ্চিত আল্লাহ তাআলা যাকে শহীদী জীবন দেন সে তো বড় সৌভাগ্যবান।

আসগর, জানো, খানো, - ওরা তো আপনার সন্তান। আশা করি ওরা সবাই আপনার স্নেহাধীন - অনুগত।

প্রিয় আম্মাজান! আপনার কাছে সর্বশেষ আর্তি। আপনি আমার প্রতি সব সময় সন্তুষ্ট থাকবেন। ইনশাআল্লাহ পরকালেও আমি আপনার অনুগত থাকবো

ইতি -

আপনার নয়নের মণি

হক নেওয়াজ কিয়ানী।

সেদিনই তিনি ইংরেজীতে তার ছেলে আসগর নেওয়াজ কিয়ানীকে একটি চিঠি লিখলেন। আসগর তখন মিলিটারী কলেজের ছাত্র। সেনাবাহিনীর অফিসার পদে কমিশন লাভের জন্য আগেই দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিলেন। তাকে দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিঠি লেখলেন।

লিপা উপত্যকা

১মে ১৯৭২

আমার কলিজার টুকরো বেটা! আল্লাহ তাআলা সব সময় তোমার সঙ্গে থাকুন। তোমাদের সবার কাছ থেকে বিদায়ের সময় আমি তোমার কামিয়াবী ও আনন্দময় ভবিষ্যতের জন্য দুআ করছি। সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার সুবাদে নিজের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস গড়ে তোলো। দায়িত্বের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের জীবন যৌবনকে ব্যবহার করবে। অধীনস্ত জোয়ানদেরকে এবং নিজেকেও নিজের কমান্ডে রাখবে। সব সময় ইসলামের নামে প্রাণ উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকবে। নিজের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ দীক্ষা অর্জন করে নিয়ো। প্রতিটি পরিস্থিতির অণু বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করো, যাতে তুমি একজন সুযোগ্য অফিসার হতে পারো।-

বেটা আমার! মনে রেখো খুব দ্রুত আমার স্থানে তোমাকে বসতে হবে। আমি এমন সময় তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি যখন তুমি মাশাআল্লাহ পরিণত বয়সে পৌছে গেছো! যখন তোমার দাদাজান বিদায় নিয়েছেন তখন আমি অনেক ছোট। তবুও আমাকে অনেক কিছু সামলে উঠার গুরু দায়িত্ব নিতে হয়েছিলো। তোমার মা বোন ভাইদের প্রতি খেয়াল রেখো। ওদের সঙ্গে কঠোরতা করো না।

ইতি -

তোমার বাবা হক নেওয়াজ।

তার বড় ভাইকেও সেদিন ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখেন।

শ্রদ্ধেয় ভাইজান !

আপনার প্রতি যে আমি কতটা কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এই প্রৌঢ় বয়সের ভঙ্গুর শরীরে আমার ও আমার পরিজনকে কতই না মমতার সঙ্গে আগলে রেখেছেন। দায়িত্ব নিয়ে সবার দেখাশুনা করছেন। অথচ আমার দায়িত্ব ছিলো আপনার দেখাশুনা করা। হায় আমি সে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। আমি মহান আল্লাহর দরবারে মাথা অবনত করছি যিনি আমাকে শাহাদতের জন্য মনোনীত করেছেন। আমার চেহারায় স্বতঃস্ফূর্ত হাসি মেখে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমার সন্তান ও তাদের অনাগত সন্তানদের জন্য অনুসৃত একটি পথ রেখে যাচ্ছি। যাতে তারা সে পথের পথিক হতে পারে গর্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে। আল্লাহ তাআলা যেন আমার আকাংখা পূরণ করেন।

আফসোস হচ্ছে, পরিতাপ হচ্ছে, আমার জীবন সঙ্গীনীর জীবন আমি নিস্কন্টক আনন্দময় করতে পারিনি। আল্লাহ তায়ালা যেন সব সময় তার সাহায্যকারী থাকেন।

বিস্ময়কর মনে হতে পারে, ভবিষ্যতের কোন কোন বিষয় পূর্বেই তার সরল ছায়া বিস্তার করে থাকে।

ইতি -

আপনার স্নেহের ছোট ভাই

হক নেওয়াজ কিয়ানী

ছেলে ও ভাইয়ের কাছে কর্নেল কিয়ানীর চিঠিতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, তিনি তার শাহাদাত বরণের ইংগিত পবিত্র কুরআনের বরকতে পূর্বেই পেয়েছিলেন। তার মায়ের কাছে চিঠিতে অনেকটা সংযত ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্ত ভাইও ছেলেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তাদের কাছে ইংরেজীতে লেখার সম্ভবত কারণ এটাই ছিলো। যাতে তার মা টের না পান তার ছেলে শহীদ হচ্ছেন।

কর্নেল কিয়ানীর জোয়ানরা মেজর সাবের খান ও মেজর ইয়ার আফজাল আফরিদীর নেতৃত্বে পাহাড়ের ওপর কিভাবে চড়েছিলো সেটা বেশ দীর্ঘ কাহিনী। এত বড় কাহিনী এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

প্রায় হাজার ফিট উচ্চতা অতিক্রম করার পর জানা গেলো স্কাউটের আশিজন জোয়ান কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সম্ভবত: ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলো। রাতের আঁধার ও পাহাড়ের অজানা গিরি কন্দরে পথ হারা না স্বাভাবিক ব্যপার।

আযাদ কাশ্মীরের এই স্বল্প সংখ্যক সেনার মধ্যে এই আশিজন জোয়ান ছিলো বাহিনীর এক-তৃতীয় অংশ। কর্নেল কিয়ানী তখন অন্য পাহাড়ে অবস্থান করছেন। ওয়ারলেসে যখন তাকে এঘটনা জানানো হলো, তিনি মোটেও বিচলিত হলেন না। যোদ্ধার সংখ্যা তো এমনিতেই হাতে গোনা। তারপর এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধা লপাত্তা, এ অবস্থায় যত বড় দুর্ধর্ষ জেনারেল বা কর্নেল হোক না কেন, হামলা মুলতুবীর নির্দেশ দিতেন। কিন্তু কর্নেল কিয়ানী দুর্ধর্ষেরও দুর্ধর্ষ। তিনি নির্দেশ দিলেন, পাহাড় চড়াই অব্যাহত রাখো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সঙ্গে আছেন হামলা মুলতুবী হবেনা।

'চক পাথার' পাহড় থেকে একটু সরে আট হাজার ফিট উচু আরেকটি পাহাড় কর্নেল কিয়ানীর ছোট একটি সেনাদল মোর্চাবদ্ধ হয়ে আছেন। এ কোম্পানীর কমান্ডার ফটোহার এলাকার মেজর জামশেদ গুলজার। যিনি এক্স সোর্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট লেফটেনেন্ট কর্নেল (অব) মুহাম্মদ গুলজার খানের ছেলে। এ কোম্পানীর এক অংশ আগেই অন্য পাহাড়ে গিয়ে পজিশন নিয়েছে। কর্নেল কিয়ানী মেজর জামশেদ গুলজারকে ওয়ারলেসে নির্দেশ দিলেন, তোমার পোষ্ট থেকে নিচে নেমে আসো এবং পাহাড়ের অন্যদিক থেকে 'চক পাথার' এর ওপর হামলা করো।

মেজর জামশেদ গুলজারকে তার জোয়ানদের নিয়ে আট হাজার ফিট উচ্চতা থেকে নেমে তারপর সারে নয় হাজার ফিট পাহাড়ে চড়ে এবং কোন ধরনের বিশ্রাম না নিয়ে হামলা করতে হবে। পাহাড় থেকে অবতরণ পাহাড় আরোহণের চেয়ে কষ্টদায়ক ও কঠিন কাজ। তবুও মেজর জামশেদ খুব দ্রুত পাহাড় থেকে নেমে শত্রু কবলিত পাহাড়ে আরো দ্রুত জোয়ানদেরকে নিয়ে উঠলেন।

মেজর জামশেদ বলেন, আমার ওয়ারলেসে কর্নেল কিয়ানীর দরাজ কণ্ঠ একটু পর পর শোনা যাচ্ছিলো। একবার তিনি বললেন, "বেটা মেজর জামশেদ ! পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি জপতে জপতে এগিয়ে যাও। ফিল্ড মাইন ও দুশমনের মেশিনগানের গোলা তোমাদের পথ দেখাবে।'

আয়াতটি তিনি পাঠ করতে লাগলেন। যার অর্থ হলো, "যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী তাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দানের ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা।

ফায়ারিং ও গোলাগুলির এমন প্রচন্ডতা ছিলো যে, ধোয়ায় চারদিক ঝাপসা হয়ে আসছিলো। পাহাড়ি গাছগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিলো। পুরোটা পরিবেশ

আগুনের গোলায় পরিণত হলো। নমরূদের এই অগ্নিকুন্ডের মধ্য দিয়ে মেজর জামশেদ ও তার জোয়ানরা অক্ষত- নিরাপদে বেরিয়ে গেলো। কর্নেল কিয়ানী যখন তার পজিশনে দাঁড়িয়ে লড়াই কন্ট্রো করছিলেন তখন থেকে থেকে বিড় বিড় করে তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠছিলো।

মেজর জামশেদ গুলজার সে সময়ের প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি একটি চিঠির মাধ্যমে তার বাবা লেফটেনেন্টে কর্নেল মুহম্মদ গুলজারকে যুদ্ধ শেষে জানান। চিঠিতে লড়াইয়ের অনেকখানি উঠে আসে। চিঠিটি ছিলো এরকম,

শ্রদ্ধাস্পদ আব্বাজান :

আসসালামু আলাইকুম।

আপনি লিপা উপত্যকায় অপারেশন সম্পর্কে অনেক কথাই শুনে থাকবেন। কিন্তু সেখানে যা ঘটেছিলো তা এরকম ঃ

১৯৭২ এর শেষের দিকে ভারতীয়রা বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে আচমকাই লিপা উপত্যকার অনেকখানি অংশ দখল করে নেয়। তারপর থেকে তাদের অতি আক্রমণাত্মক আচরণ আমরা সয়ে যেতে লাগলাম। উপত্যকার সব উঁচু অংশগুলো তাদের দখলে চলে গেলো। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের চরম সংকটের মধ্যে থাকতে হতো। যেকোন সময় ওরা আমাদেরকে মুজাফফর আবাদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতো।

যুদ্ধ বন্ধের সামরিক চুক্তির কারণে ওরা হামলা মুলতবী রাখলেও মৌখিকভাবে কয়েকবারই এ হুমকি দিয়েছে, আমরা যেন উপত্যকা খালি করে চলে যাই। ওদের অবস্থান এমন উচ্চতা ও অনুকূল ছিলো যে, আমাদের প্রতিকূল অবস্থানে থেকে মনে হতো, আমরা ওদের পায়ের নিচে বসে আছি। ওদের পা চাটছি আমরা। তারপরও আমরা এমন এক ট্রাজেডির সম্মুখীন ছিলেম যে, দুশমন আমাদেরকে মাটির পুতুলের অধিক কিছু মনে করতো না। সেটা হলো, যুদ্ধ বন্ধ চুক্তির পর আযাদ কাশ্মীরের একটি ব্যাটালিয়ান চারদিক থেকে দুশমনের ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়ে গেলো। তাদের ওখানে রসদ সরবরাহের জন্য ছিলো অতি সংকীর্ণ একটি রাস্তা। এই রাস্তাও দুশমনের করুণার ওপর আমরা ব্যবহার করতাম।...

'দুশমনের লোলুপ দৃষ্টি উপত্যকার অবশিষ্ট অংশের ওপর এমনভাবে গেঁথে রইলো যে, আমরা যেন এর কাটা সব সময় অনুভব করতাম। দুশমনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন যেন দিন দিন আমাদের জোয়ানদের মধ্যে দ্বিগুণ থেকে দিগুণতর হতে লাগলো। ১ মে ১৯৭২ দুশমন তাদের পরিবেষ্টিত আযাদ কাশ্মীরের রসদ সরবরাহের পথটি বন্ধ করে দিলো। ওদের ধারণা ছিলো

কোম্পানী ইমোনেশন ও রসদের অভাবে ঘাবড়ে গিয়ে হয় আত্মসমর্পণ করবে না হয় পোষ্ট খালি করে দিবে।...

'কিন্তু দুশমন যখন দেখলো, আযাদ কাশ্মীরের জোয়ানরা একেবারেই নির্বিকার তখন তারা ভীষণ ক্ষেপে উঠলো। ৩/৪ মে রাত লিপা উপত্যকায় কেয়ামতের বিভীষিকা নামিয়ে দিলো ওরা। মটরগান ও দূরপাল্লার কামানগুলো অবিরাম গর্জাতে লাগলো। আমাদের সৈন্যসংখ্যা ও ফায়ার পাওয়ার এতই দুর্বল ছিলো যে, দুশমন শতভাগ নিশ্চিত ছিলো সহজেই আমরা লেজ গুটিয়ে পালাবো। পরিস্থিতির বিচারে এটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অমিত শক্তি সম্পর্কে তাদের কোন উপলব্ধিই ছিলো না, যা আমাদের আত্মার খাঁজে খাঁজে যথাসময়ে ঝলকে উঠে। ওরা ভুলে গিয়ে ছিলো সে খোদায়ী নুসরতকে যা আমাদের প্রতিনিয়তের সঙ্গি।...

'পুরো উপত্যকার প্রতিটি ধূলি কণা প্রকম্পিত হচ্ছিলো। কালো ধোয়ায় চারদিক ঢেকে গিয়েছিলো। স্থানীয় দিন মজুর শ্রেণীর লোকেরা পাহাড়ের নিরাপদ গুহায় আশ্রয় নিয়েও ঠক ঠক করে কাঁপছিলো। রাত শেষ হয়ে সকাল দুপুর বিকাল সারা দিনই চললো দুশমনের এই ধ্বংসযজ্ঞ।...

'এমন কিংকর্তব্য বিমূঢ় পরিস্থিতিতে যে কোন কমান্ডার দিশেহারা হয়ে দিগবিদিক ছুটে পালাবে। তাছাড়া এখানে শত্রু পক্ষ কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী এবং তাদের অবস্থানও অনেক সুবিধাজনক স্থানে। এ অবস্থায় জবাবী হামলার কথা কল্পনা করাও হাস্যকর। কিন্তু কর্নেল কিয়ানী ছিলেন আমাদের অধিনায়ক। আমাদের অভিভাবক। যিনি একেবারেই অন্য ধাতুতে গড়া পার্থিব সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। সাক্ষাত বজ্রের ভয়াবহতা নিয়ে তিনি আমাদের হাল ধরলেন। জবাবী হামলার প্রায় অসম্ভব এক প্লান তৈরী করলেন। ...

'৫মে রাত সাড়ে তিনটায় কর্নেল কিয়ানী রেডিও ওয়ারলেসে আমাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার মতো করে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। মেজর সাবির শহীদকেও একই নির্দেশ দেয়া হলো। পর মুহূর্তে আমার ওয়ারলেস আবার বেজে উঠলো। কর্নেল কিয়ানীর গলা! তিনি বলছেন, বেটা জামশেদ! তোমার জোয়ানদের বলে দাও দুশমন তোমাদেরকে দেখে অন্ধ হয়ে যাবে। ওদের পুতে রাখা বোমাগুলো তোমাদের এক চুলও ক্ষতি করতে পারবে না।

'আমি আমার সিংহপ্রাণ জোয়ানদের হামলার হুকুম দিলাম। জোয়ানরা এ হুকুমের জন্যই আকুল হয়ে অপেক্ষা করছিলো।

দিগন্ত রেখায় ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই জোয়ানরা চিতার মতো ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রতিটি জোয়ান জযবা আর আবেগে পাগল

হয়ে যাচ্ছিলো। আমাদের এ হামলা এতই ক্রোধ উন্মত্ত ছিলো যে, দুশমনের মেশিন গান. মর্টার, কামান ও গ্রেনেড আমাদের পথে যে আগুনের নিরেট দেয়াল দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো, সে দেয়াল আমরা যেন তুরি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আগুনের সে সমুদ্রে আমার জোয়ানরা কয়েকগুণ আগুনের উত্তপ্ততা নিয়ে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।...

এক একটি বাংকারে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো আর বিদ্যুৎ গতিতে দশ বারজন করে শিখকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছিলো। ওদের মাথার খুলি উড়ে যাচ্ছিলো। বুক ঝাঝরা হয়ে যাচ্ছিলো। দুশমনের মৃত্যু চিৎকার জোয়ানদের উন্মাদনা- জযবা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিলো।...

ক্রোধে পাগলপারা হয়ে যাচ্ছিলাম আমিও। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই হারানো স্বাধীনতাকামী ভাইদের মুখগুলো; দুশমনরা অন্যায়ভাবে আটকে রেখে যাদেরকে নিপীড়ন করছে। তখনকার নিরস্ত্র নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করছে। ভেসে উঠছে সেসব শিশুর কচি মুখ; কসাই ভারতীয়দের পৈশাচিক হামলায় মার মুখ খালি করে শহীদ হয়েছে। সেই দুশমন আজ আমাদের খোলা অস্ত্রের মুখে। নর পিশাচ শিখরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করছিলো। প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছিলো। যারা ধমক ছাড়া আমাদের সঙ্গে কথা বলতো না। অহংকার ও ঔদ্ধত্যে যাদের ঘাড় সব সময় বেঁকে থাকতো। তারা আজ আমাদের পদতলে; আমাদের করুণার ওপর।...

'তাদের জীবন মরণ আমাদের অনুগ্রহের ওপর, আজ ওরা সেদিনকে গালি দিচ্ছে যে দিন ওদের মা ওদেরকে ভূমিষ্ঠ করেছিলো। ওরা আজ ওদের সে সব জেনারেলকে নিকুচি করছে যারা ওদেরকে সাক্ষাৎ যমদূতের কাছে ঠেলে দিয়েছে।

'দুপুরের আগেই আমরা চক পাথর পাহাড় দুশমন থেকে ছিনিয়ে নিলাম। তারপর প্রতিরক্ষীয় পজিশন নির্ধারিণে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আচমকা দুশমন তাজাদম সৈন্য নিয়ে জবাবী হামলা চালালো। এবার যেন ওরা কেয়ামততের বিভিষিকা নিয়ে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। আমরা আরেকবার মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম। আমাদের না ছিলো সেনা সাহায্যের আশা, না ছিলো তাজাদম সৈন্য। আর না ছিঁলো ইমোনেশন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমরা লড়তে থাকলাম। আমার চোখের সামনে শহীদ হয়ে গেলেন মেজর সাবির খান মাত্র একশ গজ দূরে। আমি মোটেও বিচলিত হলাম না। সঙ্গে সঙ্গে আমি মেজর সাবির খান শহীদের জোয়ানদের নেতৃত্ব আমার হাতে নিয়ে নিলাম। আল্লাহ তাআলা সম্ভবতঃ আমাকে একারণেই জীবিত রেখেছেন–

"দুশমনের তাজাদম সৈন্য স্রোতের মতো এগিয়ে আসছিলো। ওরা আসছিলো জয় হিন্দ শ্লোগান তুলতে তুলতে। কিন্তু যখন আমাদের জোয়ানরা রুখে দাঁড়ালো তখন তাদের জয় হিন্দ শ্লোগান মৃত্যুর শেষ আর্তনাদে রূপান্তরিত হতে লাগলো। যেমন স্রোতের মতো ওরা আসছিলো তেমনি একের পর এক ঢলে পড়ছিলো মৃত্যু দূতের কোলে।

'দুশমনের এই জবাবী হামলা এমন ভাবে ব্যর্থ হলো যে দুশমন কোন কিছু বুঝেও উঠতে পারলো না। অসংখ্য লাশ আর যখমীদের ফেলে বেঁচে থাকা দুশমন দিক-বিদিক পালাতে লাগলো। যখমীরা পানি পানি করে গোঙ্গাচ্ছিলো। কিন্তু এখন আর পানি ওদের রক্তের শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না ...।

'দুশমনের যেসব কমান্ডাররা হুমকি ধামকি ছাড়া আমাদের কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলতো না তারা এখন অনুনয় বিনয় করতে লাগলো নতুন করে যুদ্ধ বন্ধ চুক্তি করার জন্য...।

৬মে তাদের সে অনুরোধ আমাদের কমান্ডাররা মেনে নেন...।

'খোদার অপার সাহায্য যে ছিলো এ বিজয়ের একমাত্র কারণ, এতো দিনের সূর্যের মতো স্পষ্ট। আর এই সাহায্য পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিলেন কর্নেল কিয়ানীর মতো মুমিন পুরুষ ও আমাদের ভাঙ্গাচোরা ঈমানী জজবা। ওয়ালেসে তিনি বার বার বলছিলেন। বেটা! দুশমন পালাচ্ছে... দুশমন অন্ধ হয়ে গিয়েছে ... আমার প্রিয় জোয়ানদের বলে দাও... নিজেদের পরাজয়ের বদলি নাও... কর্নেল কিয়ানীর এ শব্দগুলো আমাকে পাগল করে তুললো। আমি অনুভব করছিলাম, আমি আর রক্ত মাংসের সেই দেহ বিশিষ্ট মানুষ নই যা বোমা, গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হবে। আপাদমস্তক রূহ-আত্মা বনে গেলাম আমি। আর এই রূহ বিদ্যুৎ চমকের মতো এগিয়েই যেতে লাগলো।...

"হ্যাঁ, গত দু'মাস ধরে লক্ষ করছি দুশমনের ঘাড় এখন আর আগের মতো অহংকারে বাঁকা হয় না। তাদের গলার সেই তেজও নেই এখন। ওরা বুঝতে পারছে আমাদেরকে ভুল বুঝে ওরা চরম ভুল করছে।...

'পরিণামে শত শত সঙ্গী হারিয়েছে। হারিয়েছে ওদের দখলকৃত বিপুল পাহাড়ি এলাকা। এ দুআ করবেন আমাদের আত্ম মর্যাদা যেন আল্লাহ তাআলা এভাবে সমুন্নত রাখেন। আমৃত্যু বিজয়ের মালা আমাদের সঙ্গী করে দেন।

ইতি -

আপনার ছেলে জামশেদ গুলজার।

আযাদ কাশ্মীরের জোয়ানদের বিজয় যখন সুনিশ্চিত হলো কর্নেল কিয়ানী তখন "চিন্নাই রেঞ্জ" নামক পাহাড়ে মোর্চাবদ্ধ। তার সঙ্গে ব্যাটালিয়ান কমান্ডার মেজর গোলাম আহমদ। এখান থেকেই তারা পুরো যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। অবশেষে তিনি যখন শুনলেন তার জোয়ানদের বিজয়ের সুনিশ্চিত খবর তখন তিনি তার মোর্চা থেকে বেরিয়ে এলেন। তার দু' পাশে তখন মেজর গোলাম আহমদ। হাবিলদার গুলজার। ল্যান্স নায়ক কবির ও ল্যান্স নায়ক যাকির হুসাইন।

আচমকা মর্টার গানের একটি গোলা তাদের মাঝখানে এসে বিস্ফারিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হয়ে গেলেন কর্নেল কিয়ানী শহীদ, মেজর গোলাম আহমদ শহীদ ও ল্যান্স নায়ক কবির শহীদ। কর্নেল কিয়ানীর মাথায় তখনো কাফনের কাপড়টি বাঁধা। তার মুখখানি কেমন সজীব-স্নিগ্ধ। এভাবে শহীদ হওয়ার জন্যই মনে হয় তিনি মোর্চা ছেড়ে বেরিয়া এসেছিলেন, যার সুসংবাদ তিনি পেয়েছিলেন এ লড়াইয়ের আরো অনেক আগে।

কর্নেল হক নেওয়াজ কিয়ানী শহীদকে আরো একবার (মরণোত্তর) স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়। কারণ কর্নেল কিয়ানী স্বাধীনতার সেই মহান সৌধ যা কখনো পরাজিত হয়নি। যার অমরত্ব আরশ পর্যন্ত উচ্চকিত হয়েছে।

তার শহীদ হওয়া ও এ সম্পর্কিত আভাস-ঈংগিত পূর্ব থেকেই পাওয়ার ব্যাপারটি পুরো লিপা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ লড়াইয়ের প্রায় মাস তিনেক পর আগস্টের শুরুতে এক বিকালে দেখা গেলো, ভারতীয় শিখ রেজিমেন্টের একটি বড় দল নিরস্ত্র হয়ে হাতে সাদা পতাকা নিয়ে আযাদ কাশ্মীরের ক্যাম্পের দিকে আসছে।

ক্যাম্পের কমান্ডার তখন মেজর জামশেদ গুলজার। শিখ কমান্ডার অমরনাথ শিখ তার সঙ্গে নিচু স্বরে কিছুক্ষণ আলাপ করলো। যার সারমর্ম হলো, সে লড়াইয়ে আযাদ কাশ্মীর তথা মুসলমানদের এমন অসম্ভব বিজয় তাদের অন্তরের চোখ খুলে দিয়েছে। এবং কর্নেল কিয়ানীর এভাবে শহীদ হওয়ার ঘটনা তাদের ভেতর আলো জ্বেলে দিয়েছে। তারা এখানে ৩০৯ জন জোয়ান আছে। সবাই মুসলমান হতে চায়।

সেদিনই আসরের নামাজের পর ৩০৯ জন বিধর্মী মুসলমান হয়ে গেলো। এভাবেই একটি প্রাণের বিশ্বাসের ঝলকে ঝলকে উঠলো শত শত প্রাণ।

# মেজর ডাগলাস
# মানুষ ও গাঁধা

গাঁধা তো গাঁধাই। শুদ্ধ করে বড়জোর তাকে গর্দভ বলা যায়। তাকে সাজিয়ে পরিয়ে আদর করে সোহাগ করে যতই মাথায় তোলা হোক, সে গাধাই থেকে যায়। তার স্বজাত নির্বোধীয় কার্যকলাপের কোন উন্নতি ঘটে না। কিন্তু সুস্থ সুবোধ মানুষকে যখন 'গাঁধা' বলা হয় বা 'গাধা' বলে মনে করা হয়, তখন ফলাফল হয় ভিন্ন রকমের।

সাদা চামড়ার ইংরেজরা নিজেদের নির্বোধীয় কর্মকান্ডকে মহাবুদ্ধি ধরের কীর্তি বলে জাহির করার জন্য কালো চামড়ার লোকদের গাঁধা ভাবতে পছন্দ করে এবং তাদেরকে ঘৃণাও করে। কালো-শ্যামলা সবই তাদের চোখে অচ্ছূত। যেখানেই তারা তাদের শ্বেত শাসন চালিয়েছে, যে দেশেই জবর-দখল চালিয়েছে; সেখানকার মানুষ তাদের চোখে ছিল গাঁধার মতো নির্বোধ।

আমাদের মেজর ছিলো ডগলাস কার। সে নিশ্চয়ই তার সন্তানদের মরার আগে একবার না একবার বলে গেছে, মানুষকে কখনো গাঁধা মনে করতে নেই।

ঘটনাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের। জার্মান সেনারা তখন উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ায় প্রবেশ করেছে। তাদের বিখ্যাত সেনাপতি জেনারেল রোমেল উত্তর আফ্রিকায় হামলা চালিয়ে ইংরেজদের চরমভাবে পিছু হটতে বাধ্য করে। ইংরেজ সেনাবাহিনীতে তখন হিন্দুস্তানী অর্থাৎ উপমহাদেশের সেনারা যোগ দিয়েছিলো। এরপর ইংরেজ বাহিনী আমেরিকা থেকে সেনা সাহায্য নিয়ে জবাবী হামলা চালায় জার্মানদের ওপর। ও দিকে জেনারেল রোমেল নিজের দেশের ডিক্টেটর শাসক হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয় এবং তাকে উত্তর আফ্রিকা ছাড়তে হয়। এ সময় সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াইটি হয় 'বেনগাজী' ও 'আল-

আমীন' নামক মরু সাহারায়। মরুর ইতিহাসে সেটাই ছিলো গোলা-বারুদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

জার্মানদের পিছু হটার পর দেখা গেলো, সেই মরু অঞ্চলের অবস্থা বড়াই ভয়ঙ্কর। গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গিয়েছিলো। মানুষের পরিবর্তে সেখানে রাজত্ব দখল করে মানুষ খেকো হিংস্র প্রাণী। চারদিকে লাশ আর লাশের ছড়াছড়ি। জ্বলে যাওয়া এবং ভেঙ্গে যাওয়া ট্যাঙ্কের ভেতরও মানুষ খেকো প্রাণী দেখা যাচ্ছিলো।

ইংরেজ ফৌজে আমি ছিলাম মেজর পদাধিকারী। তখন ছিলাম 'বিন গাজী' থেকে তেইশ মাইল দূরের এক ফৌজি পোষ্টে। এটা ছিলো লিবিয়ার এক প্রদেশ সিগনালারের হেড কোয়াটার। এ এলাকা থেকে যুদ্ধের উত্তাপ এখন অনেক দূরে সরে গেছে। মিত্র বাহিনী তখন রোম সাগর পাড়ি দিয়ে ইটালি বিজয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। তাই আমরা সিগনালারের হেড কোয়ার্টারে বসে দারুণ আমোদে সময় কাটাচ্ছিলাম।

বলছিলাম মেজর ডাগলাসের কথা। তিনি এসেছিলেন বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স থেকে। সিগনালারের ভাষা ছিলো আরবী ভাষার অশুদ্ধ রূপ। মেজর ডাগলাস মার এলাকার আরবীটা বেশ বলতে পারতেন। ক্যাম্পের নিম্নশ্রেণীর নওকার কর্মচারী ছিলো সে এলাকার স্থানীয় লোকেরা। এরা 'জোব্বা' পরতো। কথা বলতো আরবীতে। এদের অধিকাংশই ছিলো বেদুইন– মূর্খ। এরা ছিল এমন জগতের মানুষ বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিলো একেবারেই কম।

এসব এলাকার অধিকাংশের পেশাই হয় লুটপাট আর ডাকাতি। বেদুইনদের মধ্যে ফৌজি অফিসারদের যারা নওকর- চাকর ছিলো, তাদের পূর্ব পেশা চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি হলেও সেনাক্যাম্পে এসে এসব করতো না। আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ বেদুইনদের বড় বাজার 'বিনগাজী' থেকে আনতে হত। ইংরেজদের মদও আসতো ওখান থেকে। এখানে যুদ্ধ মুলতবী হওয়াতে আমরা নিরাপদ ছিলাম। তাই প্রয়োজন পড়লে অফিসাররা জিপ নিয়ে 'বিনগাজী' চলে যেতো। তাদের সঙ্গে তখন একজন বেদুইন নওকর অবশ্যই থাকতো।

এক সকালে মেজর ডগলাস তার নওকর বেদুইন আবদুল্লাহ গালালাকে নিয়ে জিপে চড়েন। অনেক অফিসারই প্রয়োজনীয় নানান জিনিস আনার জন্য তার কাছে পয়সা দিয়ে দেয়। সরকারি কিছু রসদ পত্রও আনার প্রয়োজন ছিলো।

খুব বেশি হলে ফিরতে তাদের চার ঘন্টার ওপরে লাগার কথা না। সকাল সাতটায় বেরিয়ে ছিলো। এখন বারটা বাজে। ফেরার নাম নেই। তবে এনিয়ে কেউ ভাবিত হয়নি। যখন তিনটা বাজলো তখন কেউ কেউ চিন্তিত হয়ে

উঠলো। কারণ, আজ দুপুরে মরুতে ঝড় উঠেছিল। মরু ঝড় পথচারীদের জন্য বড়ই ভয়ংকর হয়ে দেখা দেয়। এক হাত সামনের কোন জিনিষও দেখা যায় না। কেউ যদি ভয়ে বসে পড়ে তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ওপর বালির ঢিবি দাঁড়িয়ে যাবে এবং এর নিচে সে সমাধিস্থ হয়ে যাবে।

এজন্য ঝড়ের সময় কেউ পথে থেমে থাকে না। যত কষ্টই হোক, দিক হারিয়ে গেলেও মুসাফিররা পথ চলা অব্যাহত রাখে। হিসাব করে দেখা গেছে এগারটার দিকে ঝড় উঠেছিলো। ঘন্টা খানেক ছিলো ঝড়ের তান্ডব। সেনা ক্যাম্প থেকে 'বিনগাজি 'পর্যন্ত নিয়মিত কোন রাস্তা না থাকলেও ফৌজি গাড়ির নিয়মিত যাতায়াতের কারণে রাস্তার একটা শক্ত আদল গড়ে উঠেছিলো। তাছাড়া মেজর জগলাস গিয়েছিলেন জিপ নিয়ে। সঙ্গে আছে অভিজ্ঞ মরুচারী বেদুইন। আশংকাজনক কোন কিছু হওয়ার কথা ছিলো না। অবশ্য জিপ নষ্ট হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

চারটা বাজার পর অন্য অফিসাররা ঠিক করলেন মেজরের খোঁজে গাড়ি পাঠাতে হবে। একটা জিপে একজন মোটর মেকানিক, দুই ক্যান পেট্রোল ও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দিয়ে আমাকে পাঠানো হলো।

গাড়ি নিয়ে আমি রাস্তায় নামলাম। চারদিকে তীক্ষ্ম চোখ রেখে গাড়ি চালাতে লাগলাম। বিনগাজী পর্যন্ত কোথাও মেজর জগলাসের গাড়ি চোখে পড়লো না। বিনগাজী শহরের কয়েকজন দোকান্দারের সঙ্গে জানাশোনা ছিলো আমার। অধিকাংশ জিনিস ওদের দোকান থেকেই আমি কিনে থাকি। ওরা জানালো, মেজর জগলাস প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নয়টার দিকে বের হয়ে গেছেন।

শহর থেকে বের হয়ে আমি সেনা চেক পোস্টেও খোঁজ নিলাম। জানা গেলো, মেজর সাহেব সেখানে গিয়েছিলেন এবং নয়টার একটু পর চেকপোস্ট থেকে বের হয়েছেন। একথা জানালো সেখানকার এক ইংরেজ মেজর।

'তিনি তো একজন ইন্টেলিজিন্সী অফিসার' আমি বললাম– 'অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। এখানকার ভাষাও জানেন। তার তো এভাবে লাপাত্তা হওয়ার কারণ নেই।'

'তিনি এখানকার ভাষা জানলেও সম্ভবত এখানকার বেদুইনদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানেন না' ঐ ইংরেজ অফিসার বললেন– 'মরু ঝড়ে যদি তিনি পথ হারিয়ে বেদুইনদের এলাকায় গিয়ে উঠে থাকেন তাহলে তার জন্য আপনাদের করার কিছুই থাকবে না। বেদুইনরা এমনিতেই আমাদের

ওপর চটে আছে। আর তাদেরকে শায়েস্তা করার ক্ষমতাও নেই ইংরেজ আর্মির।

আমার মনের আশংকা আরো ঘনীভূত হলো। আমি হেড কোয়ার্টার ক্যাম্পে ফিরে এলাম। বালির সমুদ্রে গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে চালানো যাচ্ছিলো না। ২৩ মাইলের দূরত্বে পৌছতে দুই ঘণ্টা লেগে গেলো। পৌছতে পৌছতে রাত হয়ে গেলো। না মেজর ডাগলাস তখনো পৌছেনি। তখনই কয়েকটি পার্টি তাকে খোঁজার জন্য গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলো। প্রতিটি গাড়িতেই ওয়ার্লেস সেট ফিট করা ছিলো।

মাঝ রাতের দিকে একটি পার্টি খবর পাঠালো, মেজর জগলাসকে পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানী একটি দলের নেতৃত্বে ছিলাম আমি। খবর পেয়ে পার্টি নিয়ে হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। জানতে পারলাম, মেজর ডাগলাসকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মেজরকে পাওয়া গিয়েছে খুব করুণ অবস্থায়। তৃষ্ণা, ক্লান্তি, ঝড়ের ধকল তাকে অসাড় করে ফেলেছিলো। নড়াচড়া করতেও কষ্ট হচ্ছিলো তার। জিপের বাইরে বালির ওপর পড়ন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে। জিপ গাড়ির সবগুলো টায়ারের হাওয়া বের হয়ে গিয়েছিলো। পরদিন জিপ উদ্ধার করে আনা হয়। তবে আব্দুল্লাহ গালালাকে কেউ খুঁজে পায়নি।

পরদিন সন্ধায় মেজরকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেয়া হয়। তার এই অবস্থা এবং সাময়িক অন্তর্ধান কি কারণে হয়েছিলো এটা জানার জন্য সবাই উন্মুখ হয়েছিলাম। তিনি ক্যাম্পে ফিরে এসেই হল রুমে গিয়ে বসলেন। অন্যসব অফিসারও বসলো তাকে ঘিরে। তিনি রহস্য ভাঙ্গতে লাগলেন।

'বিনগাজী' থেকে ফেরার সময় আবহাওয়া স্বাভাবিকই ছিলো। কিন্তু মাঝপথে আসার পর হঠাৎ করেই মরুতে ঝড় উঠলো। মনে হচ্ছিলো; সমস্ত মরুর বালু তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জিপের পেছন দিক ছিলো ত্রিপলে ঢাকা। আর সামনের দিক ছিলো খোলা। অর্থাৎ সামনের সিট দু'টো ছিলো খোলা আকাশের নিচে। আর ঝড় আসছিলো জিপের ডান দিক থেকে। এজন্য বালির স্রোত এমনভাবে ভেতরে এসে মুখে আঘাত করছিলো যেন গতির জানালা দিয়ে পানির উন্মাতাল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সামনের পথ দেখা যাবে তো দূরের কথা জিপের সামনের দিকও দেখা যাচ্ছিলো না।

এ অবস্থায় জিপ নিয়ে কোথাও আশ্রয় নেয়াও সম্ভব ছিলো না। কারণ, গাড়ি থামালে মুহূর্তের মধ্যেই টায়ারগুলোকে বালির ঢিবি অকেজো করে দেবে। তারপর পুরো গাড়ির উপরেই গড়ে উঠবে বড় এক টিলা।

যখন মরু ঝড় শুরু হয় তখন অল্প সময়ের মধ্যেই বড় বড় বালির টিবি টিলা ঝুড়ি ঝুড়ি হয়ে হারিয়ে যায়। সমুদ্রের পানির মতো মরু এলাকা যেন স্রোতস্বিনী হয়ে উঠে। যেখানেই সামান্য বাধা পায় সেই স্রোতধারা সেখানেই দাঁড়িয়ে যায় বড় সড় একটা টিলা। এজন্য মরুর এসব টিলাকে বলা হয় ' চলন্ত টিলা'।

মেজর ডাগলাসের মতো বিচক্ষণ এক সেনা অফিসারও নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। তার জান্তে হোক আর অজান্তে হোক এক ফাঁকে গাড়ির রুট ঘুরে গেলো অন্য দিকে। সেখানে যদি কোন পথ থাকতো সড়ক থাকতো বা চিহ্ন থাকতো তাহলে নিশ্চিত হওয়া যেতো জিপ সোজা রাস্তা ধরে চলছে। সেখানে কিছুই ছেলো না। সেটা ছিলো, নিরেট অন্ধকার। অন্ধের মতো গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে রাখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না মেজর ডাগলাসের।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঝড় থেমে গেলো, আশপাশের অবস্থান অস্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা দিতে লাগলো। মেজর তবুও গাড়ি থামালেন না। যখন দৃষ্টিসীমা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন জিপ থামালেন। নেমে চারদিকে তাকালেন। গালালা তাকে জানালো, মূল পথ থেকে তারা অনেক দূরে চলে এসেছে। এই বেদুইন ছিলো এক অভিজ্ঞ মরু রহস্য ভেদী। সে মেজরকে এক দিক দেখিয়ে বললো।

'এদিক দিয়ে পথ চললে তিন ঘণ্টার মধ্যে হেড কোয়ার্টারে পৌঁছা যাবে।'

মেজর আবার জিপে স্টার্ট দিলেন। দুই আড়াই মাইল দূরের টিলায় ভরা এলাকা দেখা যেতে লাগলো। বালির ওপর দিয়ে জিপ এগুচ্ছিলো ধীর গতিতে। হঠাৎ মেজর ডাগলাস গাড়ি হাডব্রেক করলেন। সামনে পড়ন্ত এক বস্তুর দিকে তার চোখ। সেটা চকচক করছিলো। এ জিনিস মেজর খুব ভালো করেই চিনেন। এগুলো ভূমি মাইন। এ এলাকা কিছুদিন আগেও উত্তপ্ত রণাঙ্গন ছিলো। এখানে সেনা দলের মোর্চা ছিলো, ক্যাম্প ছিলো, আবার অস্থায়ী চেকপোষ্ট, ছিলো। যেখানে এমন সৈনিকি কেন্দ্র থাকে তার সামনের এলাকায় অবশ্যই মাইন পুঁতে রাখা হয়।

মাইন মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয় এবং এর একটা পিন মাটির ওপর আড়াআরিভাবে বিছিয়ে রাখা হয়। এর ওপর হালকা করে মাটি বা বালি ঢেলে দেয়া হয়। এর ওপর পা পড়লেই মাইন বিস্ফোরিত হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর ট্যাংক বা গাড়ি হলে তা ধ্বংস করে দেয়।

জার্মানদের ভূমি মাইন আরো ভয়ংকর। ওরা মাটিতে মাইন পুঁতে একটা তার আরেকটার সঙ্গে জুড়ে দেয়। আর একটা ফুটলে একে একে সবগুলোই ফাটতে থাকে। আর সে এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত নেমে আসে।

এটা যুদ্ধবাজ সব ফৌজেরই রীতি। তারা পিছু হটার সময় এভাবে মাইন পুঁতে রেখে যায়। যুদ্ধের পর অনেক মানুষ এসবে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। যে এলাকায় মাইন বিছানো হয় সে এলাকাকে 'মাইন ফিল্ড' বলা হয়।

লিবিয়ার যুদ্ধ আক্রান্ত মরুভূমির বেদুইনরা 'মাইন ফিল্ড' খুঁজে বের করার চমৎকার এক উপায় বের করে। মরুচারী বেদুইনদের প্রধান পেশা উট পালন হলেও গাধাও পালে কেউ কেউ। ওরা যখন যাযাবরি করে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যায় তখন পথ চলে খুব সাবধানে। যেখানেই সন্দেহ হয় সামনে 'মাইন ফিল্ড' আছে সেখানে একটা গাধাকে মেরে টেরে সামনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। যদি মাইন চাপা থাকে এবং জোড়া তারের মাইন হয় তখন গাধার পায়ে সংঘর্ষ বেধে একটা মাইন ফাটলেই হলো। এক সাথে সবগুলো ফেটে যায়। এতে গাধার দেহ তো টুকরো টুকরো হয়ে যায়; কিন্তু পুরো বেদুইন দল বেঁচে যায়।

মেজর ডাগলাসের বেদুইনদের এই পদ্ধতি জানা ছিলো। কিন্তু তার কাছে গাধা ছিলো না। ছিলো শুধু তার নওকর আব্দুল্লাহ গালালা। সাধাসিধে মানুষ গালালা পরিশ্রম করতে ভালোবাসতো। নিজের মুনিবের কাজ করতো বড় নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু মেজর ডাগলাস তার কাছ থেকেই গাধার কাজটি আদায় করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন, গালালা যেহেতু অনেক দিন ধরে তার নওকরী করে এবং নিজের গোত্র থেকে অনেক দূরে থাকে, এজন্য সে জানা তো দূরের কথা অনুমানও করতে পারবে না, তাকে পাঠানো হচ্ছে গাধার স্থলে মাইন বিস্ফোরণের টার্গেট হওয়ার জন্য। আর এক গালালা মাইনের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে আরো কত গালালা আসবে। একে তো এরা বেদুইন এবং ইতর জাত। তারপর আবার মুসলমান। দুনিয়াতে এদের সংখ্যা যত কমবে দুনিয়া ততই নিরাপদ হয়ে উঠবে। আর মেজর ডাগলাসের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ এক মানব সন্তান যদি খামোখা মাইনের আঘাতে মারা যায় তাহলে দুনিয়ার মানুষের আফসোসের শেষ থাকবে না।

এই ভেবে মেজর ডগলাস গালালাকে বললেন।

'এখানে বসে থেকে এক দিক দেখিয়ে দিলে তো হবে না। সামনে গিয়ে সঠিক দিক নির্ণয় করে এসো'।

মেজরের মুখে তখন ধূর্তের হাসি খেলছিলো। অবশ্য 'মাইন ফিল্ডের' রাস্তা ছাড়া মেজরের সামনে আর কোন রাস্তা ছিলো না। দুই দিকে ছিলো টিলার সারি। সেখান দিয়ে পাড়ি নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

গালালা কোন কথা বললো না। মুখে এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে মাথা একদিকে কাত করলো। অর্থাৎ সে দেখে আসতে রাজি। গালালা সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলো। গালালা কয়েক কদম যাওয়ার পর মেজর যমিনে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, যেকোন সময় গালার পায়ের নিচ থেকে মাইন বিস্ফোরিত হবে। তখন মাইনের তীক্ষ্ম ব্লেডের টুকরো উড়ে এসে মেজরের গায়ে লাগতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় কিছুই ঘটলো না। তিনি দেখলেন, গালালা নিচের দিকে তাকিয়ে কখনো ডান দিকে কখনো বাম দিকে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পাগুলো অনেক ওপরে উঠিয়ে আবার সাবধানে নিচে নামাচ্ছে। এভাবে দেড়শ দুইশ গজ গিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগলো একটু ধূসর পথে।

গালালা মেজরের দিকে না এসে জিপের দিকে এগিয়ে গেলো অতি সহজ ভঙ্গিতে। যেন জিপের মধ্যে জরুরী কিছু একটা আছে। সেটা তার এখনই খুব দরকার। সামনের সিটের ওপর রিভলবার পড়েছিলো। পাশে পড়েছিলো গুলি ভরা কার্তুজের বাক্স।

এটা মেজরের ব্যক্তিগত রিভলবার। মেজর ভাবলেন, আব্দুল্লাহ গালালা হয়তো দরকারী কোন কিছুর জন্য জিপে উঠেছে। এজন্য তিনি যেভাবে ছিলেন সেভাবেই রইলেন। কিন্তু একটু পর খুটখাট আওয়াজ হলে উঠে বসলেন। দেখলেন, গালালা রিভলবারে গুলি ভরছে। কি ঘটছে প্রথমে তিনি হুতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর হন্তদন্ত হয়ে জিপের দিকে ছুটে গেলেন।

কিন্তু ততক্ষণে গালালা রিভলবারে ছয়টি গুলি ভরে ফেলেছে এবং তার নল মেজরের দিকে তাক করে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সির এত বড় দুর্দান্ত অফিসার সামান্য এক বেদুইনের দিকে করুণা প্রার্থী চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি একজন মানুষ, গাধা নই'– আব্দুল্লাহ গালালা গম্ভীর গলায় বললো, তুমি আমাকে মেরে তোমার রাস্তা পরিষ্কার করতে চেয়েছিলে। সেখানে অসংখ্য

মাইন ওঁৎ পেতে ছিলো আমার জন্য। ঝড়ের তান্ডবে সবগুলোর উপর থেকে বালি মাটি সরে গেছে। এজন্য আমি সাবধানে এগিয়ে আবার ফিরে আসতে পেরেছি।

না হয় এতক্ষণে আমার দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। তোমাদের সাদা চামড়ার ইংরেজদের মত ধূর্ত শয়তান নই বলেই আমরা সবসময় ঠকে এসেছি। সাধারণ একটা গাধার মূল্যও তোমরা আমাদেরকে দিতে চাও না। আমি আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবো। আর শুনে রেখো, মরুচারীরা যে তাদের গাধা দিয়ে মাইন ফিল্ড খুঁজে বের করে সেটা আমার অজানা নয়।'

মেজর ডাগলাস নিজেকে কিছুটা সামনে নিয়েছিলেন। গালালার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে অফিসারের মতো হুকুমের সুরে বললেন, 'রিভলবারটি দিয়ে দাও আমাকে।'

'আয় ফিরিঙ্গ', গালালার কণ্ঠ চিড়ে যেন চাবুক বেরিয়ে এলো, 'আমি তোমাদের নুন খেয়েছি এজন্যে তোমাকে হত্যা করবো না। মুসলমানরা তোমাদের মতো বেঈমান নয়। যদি পথ হারিয়ে মরে যাও আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। যাও, হাঁটতে থাকো। দাঁড়িয়ে থাকলে গুলি চালাবো আমি ... যাও?'

গালালার খুনি মূর্তি দেখে মেজর হাঁটতে শুরু করলেন। কয়েক কদম গিয়ে ফিরে গালালার কাছে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো, সে যেন তাকে মাফ করে দেয় এবং জিপটি তাকে ছেড়ে দেয়।

গালালা বাতাসে ফায়ার করে বললো, 'হাঁটতে থাকো গাঁধা; আমাকে গাঁধা মনে করো না।'

মেজর হাঁটা শুরু করলেন গোমরা মুখ করে। আর গালালা জিপের টায়ারগুলো ফুটো করে দিতে লাগলো। তারপর গালালা মেজরের যা কিছু ছিলো তা নিয়ে এক দিকে হাঁটা ধরলো।

'মুসলমানদের আমরা যতটা নির্বোধ মনে করি, 'পরে ডাগলাস স্বীকার করেন– 'তারা আসলে ততটা নির্বোধ নয়। প্রয়োজনে আমাদের চেয়েও অনেক বিচক্ষণ। ওদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধও অনেক বেশি। সত্যি বলতে কি সেই বেদুইন আমাকে আসলে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিক্ষা দিয়েছে।'

# সিংহ পুরুষ
# অহিংস কাহিনী

১৯২২ সাল। মারাকেশ তখন গোলাম ছিলো। গোলাম ছিলো দুই সাম্রাজ্যবাদীর। মারাকেশের এক অংশ দখল করে রেখেছিলো স্পেনিশরা। আরেক অংশ দখল করে রেখেছিলো ফ্রান্সীয়রা। তবে বেশির ভাগ এলাকা ছিলো ফ্রান্সীয়দের দখলে।

১৯২২ সালের প্রথম দিকের কথা। মারাকেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্পেনিশ ফৌজের একটি ক্যাম্প রয়েছে। সেখানে প্রায় এক হাজার সেনাবাহিনী রয়েছে। স্পেনিশ জেনারেল সেই ক্যাম্পে এক জরুরী কাজে গেলেন। স্পেনিশ সেই জেনারেলের নাম 'জেনারেল সেলিষ্টার'।

জেনারেলের এই আগমন ছিলো আসলে ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য। এজন্য সেনা ও তাদের কমান্ডাররা বেশ সতর্ক এবং ফিটফাট হয়ে ছিলো। প্রত্যেক সৈন্য এবং ক্যাম্পের প্রতিটি কোন জেনারেলের পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখা ছিলো। জেনারেল সেলিষ্টার ক্যাম্প পরিদর্শন করছিলেন।

আচমকা ক্যাম্পের ভেতর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেলো। ক্রমেই সেটা প্রলয়ের বিভীষিকায় রূপ নিলো। ক্যাম্পের ভেতর আসলে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। হামলা করেছিলো মারাকেশের নির্যাতিত মুজাহিদরা। যাদের সংখ্যা ছিলো স্পেনিশ বাহিনীর দশ ভাগের এক ভাগ। মারাকেশের মুজাহিদদের অস্ত্র ছিলো লোহার লাঠি, তলোয়ার, বর্শা ও খঞ্জর। এগুলো দিয়ে তারা এমন এক সেনাবাহিনীর ওপর হামলা করলো, যাদের কাছে ছিলো অত্যাধুনিক রাইফেল, মেশিনগান, গ্রেনেড, দূরপাল্লার পিস্তল, ট্যাংক ও কামান।

তবে মুজাহিদদের এই হামলা ছিলো অত্যন্ত তীব্র এবং একেবারেই আচমকা। যার জন্য কেউ প্রস্তুত তো ছিলোই না এবং প্রস্তুত থাকার কথাও নয়। আসলে মুজাহিদদের এই হামলায় সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র ছিলো সেটা হলো,

পরাধীনতা থেকে মুক্তির জ্বালা ও স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনা। আর ছিলো পাহাড়সম সংকল্প, বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস।

এই অনমনীয় সংকল্প ও তুঙ্গস্পর্শী আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুজাহিদরা এমন প্রচণ্ড হামলা চালালো যে, জেনারেল সেলিষ্টার পালাতে গিয়ে মারা পড়লেন। কিছু স্পেনিশ অফিসার পালাতে সক্ষম হলো এবং দেড় দুইশ সৈনিক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারলো। যারা পালাতে পারলো না, ক্যাম্পে রয়ে গেলো। তারা ছিলো মারাত্মকভাবে আহত। এদের সংখ্যা ছিলো প্রায় সাতশ। আর বাকিরা হলো নিহত।

তারপর মুজাহিদরা স্পেনিশদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করলো, যেখানে ওরা সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছিলো।

এটা ছিলো মারাকেশের মুজাহিদদের প্রথম হামলা। এর নেতৃত্ব দেন অখ্যাত এক লোক। যিনি পরবর্তীতে আব্দুল করীম নামে সারা দুনিয়ায় খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ফ্রান্স ও স্পেনে তার নাম ছিলো, কোথাও কোথাও কিংবদন্তী তুল্য, কোথাও জলজ্যান্ত এক আতঙ্ক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চার বছর আগে ফ্রান্সীয় সৈন্যরা নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে মারাকেশে প্রবেশ করে। তারপর প্রতারণা ও দখলদারিত্বের অপচক্রে ফেলে এবং সেনাশক্তি প্রয়োগ করে মারাকেশের বড় একটা অংশ দখল করে নেয়। স্পেনিশরাও এ ধরনের পেশি শক্তির জোরে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মারাকেশের আরো কিছু অংশে জুড়ে বসে।

প্রথম যুদ্ধের পর ফ্রান্সীয়রা আলজাযায়েরের সঙ্গে সঙ্গে মারাকেশকেও নিজেদের করদরাজ্যে রূপান্তরিত করে। সেখানে অসংখ্য ফ্রান্সীয় সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। আর এই সুযোগে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভূমিহীন অধিবাসীদেরকে মারাকেশে আবাদ করতে শুরু করে। স্পেনিশরাও নিজেদের দখলকৃত অংশে স্পেন ও ইউরোপীয়ানদের বসত গড়তে শুরু করে।

সাম্রাজ্যবাদী এই দুই জাতি মারাকেশের মুসলমানদের নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকার সব পথ বন্ধ করে দেয়। এই দুই সন্ত্রাসী, দখলবাজ জাতির উদ্দেশ্য ছিলো একটাই। সেটা হলো, মারাকেশ যেন ইসলামী রাষ্ট্র বলার যোগ্য না থাকে।

ফ্রান্সীয় ফৌজি কমান্ডার তখন জেনারেল লাইটে। অতি দক্ষ ও চালবাজ জেনারেল হিসাবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। তিনি মারাকেশকে তাদের গোলামির শৃংখলে ফাঁসানোর জন্য সেই চালই চেলেছেন, যে চাল চেলেছিলো ইংরেজরা

উপমহাদেশ দখল করতে গিয়ে। মারাকেশের নেতৃস্থানীয় মুসলমান, যারা বিভিন্ন গোত্র ও রাজনৈতিক অংগ সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেন জেনারেল লাইটে। শত্রুতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেন মারাকেশের নেতাদের মধ্যে। এভাবে মারাকেশের জাতীয় ঐ ধ্বংসের দোড়গোড়ায় পৌছে দেন জেনারেল লাইটে।

মারাকেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও গোত্র সরদারকে ফ্রান্সীয়রা অঢেল ধন-সম্পদ ও জায়গীর এবং সুন্দরী নারী দান করে। এভাবে মারাকেশ একটা পর্যায়ে এসে দাসত্বের চরম অবমাননা মেনে নেয়। কিন্তু মারাকেশের এমন একটি প্রাণীকেও পাওয়া গেলো না, যে এর বিরুদ্ধে সামান্য 'টু' শব্দটি করবে। মনে হচ্ছিলো, মারাকেশের মুসলমানদের মধ্য থেকে স্বাধীনতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে গেছে। মরে গেছে তাদের আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতি।

তবে জীবন্ত কোন জাতির সন্তানরা মরে যেতে পারে, কিন্তু জাতির জাতীয়তাবাদ জীবন্তই থাকে। যা তারই কোন এক সন্তানের রূপ ধরে আগ্নেয়গিরী হয়ে বিস্ফোরিত হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই জাতির বিবেকবোধ সীমাহীন আত্মশ্লাঘা নিয়ে জেগে উঠে।

মারাকেশের পাথরচাপা বিবেকও জেগে উঠলো। সে ছিলো এক গোত্র সরদারের ছেলে। সদ্য যৌবনে পা দিয়েই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার উদাত্ত শ্লোগান তুললো সেই সরদারের অগ্নিসন্তান। তার নামই আবদুল করীম আল খাত্তাবী।

তার বাবা তাকে আইন শিক্ষা দেন। আইনের ডিগ্রি নিয়েও সম্মানজনক জীবনের সুযোগ সুবিধা তাকে দিতে রাজি ছিলো না ফ্রান্সীয় ও স্পেনিশরা। কারণ, সে ছিলো মুসলমান। তাদের কাছে মুসলমান হওয়া এক অপরাধ। ধার্মিক হওয়া অন্যায় কর্ম। মানবিক ও সামাজিক হওয়া মানে দুর্বলতা।

স্পেনিশদের দখলকৃত অংশে আবদুল করীমরা থাকতো। আইনের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি থাকার পরও সম্মানজনক কোন চাকুরি সরকার তাকে দিলো না। তবে আধা সরকারি ধরনের একটা চাকরি পেলো আবদুল করীম। সেটা হলো, স্পেনিশ ফৌজের অফিসারদের স্থানীয় 'বরবার' ভাষা শিক্ষা দেয়ার কাজ। মারাকেশের লোকেরা এ ভাষাতেই কথা বলতো।

আবদুল করীমের মনে মারাকেশের স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনা তাকে সবসময় দারুণ উজ্জীবিত রাখতো। সঙ্গে সঙ্গে দখলদার ভিনদেশী মুনিবদের বিরুদ্ধে অবিমিশ্র ঘৃণা তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। তার এই জাগ্রত উপলব্ধি সে গোপন রাখতে পারতো না।

একদিন স্পেনিশ অফিসারদের ক্লাশ নিচ্ছিলো আবদুল করীম। ক্লাশে স্পেনিশ জেনারেল সেলিষ্টারও ছিলেন। এক অফিসার ক্লাস টেষ্ট না পারায় আবদুল করীম তাকে মৃদুর্ভসনা করে। জেনারেল সেলিষ্টার এটা মানতে পারলেন না। গোলাম হয়ে, অধীনস্থ হয়ে তার মুনিবকে এভাবে ধমকে উঠবে– এটা জেনারেল কোনভাবেই মানতে পারছিলেন না। তিনি চটে উঠলেন।

'নিজেকে আমাদের কর্মচারীর বেশি মনে করো না করীম! ভদ্রভাবে কথা বলবে। এমন আচরণ সহ্য করা হবে না'। জেনারেল সেমিষ্টার বললেন।

আব্দুল করীম জেনারেল সেলিষ্টারের কথায় ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলেন। জেনারেলের দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে বললো,

'এর চেয়ে বড় অভদ্রতা আর অসৌজন্যতা কি হতে পারে যে, তুমি তোমার শিক্ষককে ধমকাচ্ছো। এমন উগ্র ছাত্র কোন শিক্ষকই পছন্দ করবে না।'

জেনারেল সেলিষ্টার একথার জবাবে আব্দুল করীমকে গালমন্দ করলো। আবদুল করীম মুখে বিদ্রুপাত্মক হাসি নিয়ে বললো,

'শোন! স্পেনিশ অফিসাররা! মারাকেশ মুসলমানদের, তোমাদের না। একদিন না একদিন তোমাদের এখান থেকে বের হতেই হবে।'

আবদুল করীম ক্লাশ সেখানেই মুলতুবী করে ক্লাশ থেকে এই বলে বেরিয়ে গেলো,

'আমি তোমাদের এই নোংরা চাকরির ওপর অভিশাপ দিচ্ছি।'

তারপর আবদুল করীম তার বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারলো না। জেনারেলকে আবদুল করীম যা বলে এসেছে তা স্বৈর আইনে সরাসরি বিদ্রোহ ছিলো। বাড়ির অর্ধেক পথে থাকতেই তাকে গ্রেফতার করা হলো। বিনা বিচারে তার জেল হয়ে গেলো।

জেলখানায় তার বিশ দিনও কাটেনি। একদিন সকালে জেলখানায় একটি সংবাদে বোমা ফাটার মতো অবস্থা হলো। সেটা হলো আবদুল করীম ফেরার হয়ে গেছে।

আজ পর্যন্ত কেউ এটা আবিষ্কার করতে পারেনি, রাতের বেলা আবদুল করীম পাহাড় সমান এত উঁচু প্রাচীর কি করে টপকালো। তাও সে প্রাচীর ছিলো ন্যাড়া পাহাড়ের মতো খাড়া এবং মসৃণ। প্রাচীরের কোথাও কোন খাঁজ ছিলো না। স্পেনিশরা আজো এই প্রাচীর টপকানোকে অলৌকিক কীর্তি বলে মনে করে। এটা ছিলো ১৯২১ সালের ঘটনা।

জেলখানার সাধারণ প্রহরী থেকে নিয়ে জেলার পর্যন্ত কাউকে রেহাই দেয়া হলো না। আবদুল করীমের ফেরার হওয়ার কারণে সবাইকে কঠিন শাস্তি দেয়া

হলো। একজনকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হলো। অনেক খোজাখুঁজি হলো। তদন্তের পর তদন্ত হলো। কিন্তু কেউ হদিস করতে পারলো না, আবদুল করীম কোন পথে জেল থেকে পালিয়েছে।

এক কয়েদির ফেরার হওয়ার ব্যাপারটা তো এমন গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ ব্যাপার ছিলো না। স্পেনিশ জেনারেলের সামনে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠাতেই আবদুল করীমের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কিছু দিন পর যখন জানা গেলো, সে কয়েদির ফেরার হওয়ার প্রেক্ষাপট মারাকেশের ইতিহাসের মোড় পাল্টে দেবে, তখন স্পেনিশদের আরো বেশি টনক নড়লো। তারা আবদুল করীমকে যে মামুলি গুরুত্ব দিয়েছিলো তাই ছিলো তাদের সবচেয়ে বড় ভুল এবং অমার্জনীয়ও।

আবদুল করীমের ব্যাপারে খবর পাওয়া গেলো যে, সে এক দুর্গম পাহাড়ি গিরিকন্দরে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোয়ার্টার ও ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে। কিন্তু সেই পাহাড়ি উপত্যকা যে কোনটা সেটা শত চেষ্টা করেও স্পেনিশ আর্মি জানতে পারেনি বহু দিন।

আবদুল করীম অতি নিঃশব্দে এবং সুনিপুণ নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে এমনভাবে পরিচালনা করলো যে, অল্প সময়েই অসংখ্য যোদ্ধা তার ঝাণ্ডাতলে এসে সমবেত হলো। এসব যোদ্ধারা ছিলো মারাকেশের সাধারণ নাগরিক। যারা দিনের পর দিন স্পেনিশ ও ফ্রান্সীয়দের গোলাবারুদের উত্তাপ সহ্য করেছে। বাপ ভাইদের নির্বিচারে মরতে দেখেছে। দেখেছে মা বোনদের সম্ভ্রমহানি ঘটাতে। নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে সইতে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এসবই মারাকেশের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনা জাগিয়ে তুলেছে।

সেনা ফ্রান্সী হোক বা স্পেনিশ হোক, তাদের একমাত্র টার্গেট ছিলো মারাকেশী মুসলমানরা। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশের সেনারা সেখানকার জনগণের সঙ্গে হিংস্র প্রাণীর মতো আচরণ করতো। সৈনিকরা ক্ষুধার্ত মানুষের খাবার কেড়ে নিতো। মজুর-শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা পয়সা ছিনিয়ে নিতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠে ঘাটে খেলতে বেরোলে মেরে কেটে তাড়িয়ে দিতো। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর ঔষধও ছিনিয়ে নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। তাহলে কেন মারাকেশী জনগণ সেই নরপিছাচদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না? কেন জীবন বাজি রেখে দেশ দখলদার মুক্তি করতে ও স্বাধীনতার জন্য ঝাপিয়ে পড়বে না?

মারাকেশী যোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো যেটা সেটা হলো, তাদের কাছে অস্ত্র ছিলো না। তারপর আবার তাদের লড়াই ছিলো একই সঙ্গে দুই পরাশক্তির সেনাদের বিরুদ্ধে। এক ফ্রান্সীয়, আরেকটা হলো স্পেনীয় সেনা।

ফ্রান্স তো বিশ্ব মিডিয়ায় এটা ছড়িয়ে রেখেছিলো যে, মারাকেশের আসল শাসন কর্তৃত্ব স্থানীয় মুসলমানদের হাতেই রয়েছে।

এক চুক্তির অধীনে মুলত: ফ্রান্সীয় সেনাবাহিনী মারাকেশের নিরাপত্তা ও শাসন সংস্কারের নামে মারাকেশে আস্তানা পেতে বসে। অজুহাত ছিলো মরুচারী বেদুইন জাতি বিদ্রোহী হয়ে সবসময় মারাকেশের সীমান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাখতো। কখনো কখনো মারাকেশের অভ্যন্তরে তারা গেরিলা হামলা চালাতো। তাদের এ অজুহাত ঠিকই ছিলো। কিন্তু মারাকেশের মুসলমানদের শায়েস্তা করার জন্য গোপনে ফ্রান্স ও স্পেন অস্ত্রও সরবরাহ করতো। এভাবেই বেদুইনরা অস্ত্রশস্ত্রে শক্তিশারী হয়ে উঠে।

তারপর সেই বেদুইনরা যখন মারাকেশে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে সারা দেশে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়, তখন ফ্রান্স ও স্পেনিশরা উড়ে আচে মারাকেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। এভাবে মারাকেশ দখল করে তাদের নিরাপত্তা কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গতা দান করে।

অথচ সারা দুনিয়ায় মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে রাখে, মারাকেশের শাসনক্ষমতা মারাকেশের জনগণের হাতেই রয়েছে। কিন্তু এর সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য স্বাধীনতাকামীদের হাতে তেমন কোন অস্ত্র ছিলো না, না ছিলো কোন প্রচার মাধ্যম।

পুরো ইহুদী ও খ্রিষ্টান দুনিয়া মারাকেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আসলে ফ্রান্সীয় ও স্পেনিশরা প্রতিশোধ নিচ্ছিলো সালাহউদ্দিন আইয়ূবীর কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছিলো খ্রিষ্টান পরাশক্তি। পারলে তো ওরা পুরো মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়।

আবদুল করীম তার মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে নেয়। এর মধ্যে একটা বিভাগ ছিলো চার স্তর বিশিষ্ট গোয়েন্দা বিভাগ। এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতাকামীদের মোটামুটি সুশংখল একটা সেনাবাহিনী গড়ে উঠলো আবদুল করীমের নেতৃত্বে। তবে অস্ত্রবিহীন। মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো এই নিরস্ত্রতা। এজন্য প্রথম সমস্যা এবং প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো অস্ত্রসংগ্রহ। যার একমাত্র মাধ্যম ছিলো ছোট ছোট সেনা চৌকির ওপর গেরিলা হামলা চালানো।

এখন তোমাদের প্রধান কাজ হলো প্রশিক্ষণে শেখা যুদ্ধকৌশলের চর্চা ও অনুশীলন করা এবং অস্ত্র সংগ্রহ করা। এজন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, দখলদার বাহিনীর ছোট ছোট সেনাক্যাম্পগুলোতে নৈশ হামলা চালানো। সে হামলা হবে গেরিলা পদ্ধতিতে এবং অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। মনে রাখতে হবে, এজন্য শহীদ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে হামলা চালাতে হবে।' আবদুল করীম একদিন মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত করে বললো,

আত্মদানকারী একদল মুক্তিযোদ্ধাও প্রস্তুত হলে গেলো। এই দলের নাম রাখা 'শহীদ স্কোয়াড'।

এক গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে আবদুল করীম জানতে পারলো, অমুক দিন অমুক ক্যাম্প পরিদর্শনে যাচ্ছেন স্পেনিশ জেনারেল সেলিষ্টার। তার সঙ্গে এক কমাণ্ডো দলও থাকবে। সে ক্যাম্পে প্রায় এক হাজার সেনা রয়েছে। যারা সব ধরনের আধুনিক অস্ত্রশস্তে সুসজ্জিত। এমন এক বাহিনীর ওপর রাতের বেলায়ও হামলা চালানোর অর্থ আত্মহত্যার জন্য নাম লেখানো। আর দিনের বেলায় তো কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু আবদুল করীম জেনারেল সেলিষ্টারের নাম শুনতেই তার রক্ত টগবগ করে উঠলো। প্রতিশোধ স্পৃহায় আবদুল করীম যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলো। এই জেনারেলই তো তাকে অন্যায়ভাবে কয়েদখানায় ছুড়ে মেরেছিলো।

আবদুল করীম মুক্তিযোদ্ধাদের ডেকে বললো, যদি এই জেনারেলের পরিদর্শনের সময় হামলা করে এবং জেনারেলকেও খতম করে দেয়া যায়, তাহলে স্পেনিশদের পা টলে উঠবে।

মুক্তিযোদ্ধারা তো এমন হুকুমেরই অপেক্ষায় থাকতো সর্বক্ষণ। লড়তে লড়তে প্রাণ বিসর্জন দেয়াকে তো ওরা কিছুই মনে করতো না। ওরা তো পণই করে নিয়েছে, একজন সাম্রাজ্যবাদীও যদি মারাকেশে থাকে তাহলে এদেশে জীবনের কোন মূল্য থাকবে না। এর চেয়ে ভালো মারাকেশের জন্য জীবন দিয়ে দেয়া। ওরা হামলার জন্য টান টান উত্তেজনা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলো।

সংখ্যায়ও ছিলো ওরা খুব নগণ্য। আবদুল করীম ওদেরকে ট্রেনিংই দিয়েছে এমনভাবে যে, স্বল্প সংখ্যক সেনা কয়েকগুণ বেশি শত্রুসেনার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনবে। আর বিজয় অর্জন করতে না পারলেও যথেষ্ট ক্ষতি করে নিজেরা অক্ষত ফিরে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে ওদিকে জেনারেল সেলিষ্টার সেনা ক্যাম্পে পৌছে গেলেন। এদিকে আবদুল করীম ও তার সংক্ষিপ্ত মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পের কাছাকাছি এমন এক জায়গায় পৌছে গেলো যেখানে ওদেরকে দেখার মতো কেউ ছিলো না। ওরা সেখানে ঘাপটি মেরে রইলো।

জেনারেল সেলিষ্টার মাত্র পরিদর্শন শুরু করেছেন এমন সময় মুক্তিযোদ্ধারা ধারালো লাঠি, বর্শা, তলোয়ার ও খঞ্জর নিয়ে ক্যাম্পের ওপর হামলে পড়লো। এমন অতর্কিত হামলায় স্পেনিশদের তো দিকবিদিক হারানোর অবস্থা হলো। ওরা প্রতিরোধের সবরকম চেষ্টা করলো। জবাবী হামলা চালালো। কিন্তু ওদের হামলায় কোন জোর উঠলো না। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারাও ওদেরকে সামলে উঠার সুযোগ দিলো না।

এ দিকে আবদুল করীম তো জেনারেল সেলিষ্টারকে খুঁজতে লাগলো। ওদিকে জেনারেল তার বডিগার্ড ও অফিসারদের পরিবেষ্টনে থেকে নিরাপদে পালাতে চেষ্টা করছিলেন।

হঠাৎ একবার আবদুল করীম তাকে দেখে ফেললো। সেনা অফিসার ও বডিগার্ডরা তাকে নিশ্ছিদ্র পরিবেষ্টনে নিয়ে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা মুক্তিবাহিনীর ওপর গুলি চালালো। অনবরত ষ্টেনগানও চালালো। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে আহত হলো। কয়েকজন শহীদ হলো। কিন্তু আবদুল করীমের দৃপ্ত কণ্ঠ বার বার গর্জে উঠতে লাগলো, 'জেনারেল সেলিষ্টাকে আমি জীবিত বা মৃত এখান থেকে নিয়ে যাবো।'

আবারো গর্জে উঠলো আবদুল করীমের কণ্ঠ, 'মুক্তিবাহিনীর সব শহীদ হলেও আমি জেনারেল সেলিষ্টারকে ছাড়বো না।'

এ ছিলো বিস্ময়কর ও এক অসম লড়াই। বর্শা, লাঠি ও তলোয়ার লড়ছিলো স্বয়ংক্রিয় ষ্টেনগান ও বিধ্বংসী গোলাবারুদের বিরুদ্ধে। ওদিকে ছিলো বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞ দুর্ধর্ষ অপ্রতিরোধ্য আবেগ, বিশুদ্ধ চেতনা ও গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনি ছাড়া শক্তিশারী কোন অস্ত্র ছিলো না।

ওরা অনবরত গোলা ও বোমার আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে জেনারেলকে ঘিরে রাখা পরিবেষ্টনী দেয়াল ভেঙ্গে ফেললো। ওদিকে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধ নিহত স্পেনিশদের রাইফেল, ষ্টেনগান, মেশিনগানসহ অনেক ধরণের অস্ত্র নিয়ে সেখানে পৌছে গেলো। জেনারেলকে যারা এতক্ষণ দেয়ালের মতো নিরাপত্তা প্রাচীর হয়ে আগলে রেখেছিলো, তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। ক্রুদ্ধ মুক্তিবাহিনীর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারলো না। জেনারেলকে অক্ষত অবস্থায় আবদুল করীমের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো।

চরম উদ্ধত-অহংকারী স্পেনিশ জেনারেল সেলিষ্টার ভেজা বেড়ালের মতো আবদুল করীমের সামনে দাঁড়িয়ে। এত বড় যুদ্ধশক্তির জেনারেল অথচ ভয়ে থর থর করে কাঁপছেন।

আবদুল করীম ভয়ংকর শীতল গলায় বললো,

'আয়! সভ্য দুনিয়ার অসভ্য জেনারেল! আমি তোমাকে বলেছিলাম না, মারাকেশ মুসলমানদের। মারাকেশ এ দেশের জনগণের! তোমাদের একদিন এই নোংরা দখলদারিত্ব ছেড়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এমন ন্যায্য কথায়ও তোমার টনক নড়লো না। তুমি জঙ্গি শক্তির নেশায় বুঁদ হয়ে আমাকে জেলখানার অন্ধকার কুঠুরীতে ছুড়ে মেরেছো।'

'শোন! আবদুল করীম!' জেনারেল সেলিষ্টার কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমরা আমাদের জঙ্গিশক্তির মোকাবেলা করতে পারবে না। আমাদের যুদ্ধ শক্তির সামনে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। আমাকে মেরে ফেললেও তোমরা স্বাধীন হতে পারবে না। আমরা যে দেশে ঢুকি সে দেশ থেকে স্বাধীনতা নামক কাল্পনিক শব্দটি মুছে দিই। মারাকেশেও তা মুছে দিয়েছি। আমাকে মেরে কোন লাভ নেই। আর যদি মারোই তাহলে মনে রেখো, আমাকে হত্যার প্রতিশোধ মারাকেশের প্রতিটি মুসলমানের রক্ত ঝড়িয়ে নেয়া হবে। কারণ, তোমাদের কাছে আসলেই কোন অস্ত্র শক্তি নেই।'

'আমাদের শক্তি একমাত্র আল্লাহ এবং আমাদের তাজা ঈমান' আব্দুল করীম দৃঢ় কণ্ঠে বললো, তোমাদের খোদা সত্য হলে তাকে বলো আমাদের হাত থেকে তোমাকে জীবিত উদ্ধার করে নিয়ে যেতে।'

জেনারেল সেলিষ্টার প্রথমে কিছুক্ষণ হুমকি ধমকি দিলেন। তারপর সোনাদানা, নারী ও ক্ষমতার লোভ দেখালেন। বন্ধুত্ব ও সন্ধির প্রস্তাবও দিলেন এবং অবশেষে জীবিত রাখলে মারাকেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এসবের উত্তরে আব্দুল করীম নির্বিকার রইলো। শুধু শীতল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। জেনারেল সেলিষ্টারের কথা শেষ হলে আবদুল করীমের মুক্তিযোদ্ধাদের বললো,

'তোমরা প্রতিশোধ নাও। প্রতিশোধ নাও মারাকেশের সেসব নিষ্পাপ মুসলমানদেরকে হত্যার, যাদেরকে এই নির্দয়-নিষ্ঠুর জেনারেলের হুকুমে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে।'

❖❖❖❖❖

যে জেনারেলের হাত, পা, দেহ অসংখ্য মারাকেশবাসীর রক্তাক্ত লাশ দেখে হায়েনার মতো উল্লাসে দুলে উঠেছে, সেই জেনারেলের দেহে একই সঙ্গে

অনেকগুলো বর্শা, তলোয়ার ঢুকে পড়লো। জেনারেল সেলিষ্টার লুটিয়ে পড়লেন। একজন নির্মম নরখেকো ঘাতকের অপবিত্র দেহ থেকে তার প্রাণপাখিটি উড়ে গেলো।

ততক্ষণে রণাঙ্গন মুক্তিবাহিনীর হাতে চলে এসেছে। ক্যাম্পের চার দিকেই মুক্তিবাহিনীর প্রাধান্য। এর মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, স্পেনিশদের জেনারেলকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ খরবে স্পেনিশদের অবশিষ্ট মনোবলও ভেঙ্গে গেলো। পুরো ক্যাম্প ইতিমধ্যে রক্তের জোয়ারে ভেসে গেছে। পরাশক্তির অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ হলেও আজ এরা নিপীড়িত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার হাতে রক্তের বন্যায় ভেসে গেছে।

শত্রু সেনা এবার পালাতে শুরু করলো। কিছু সৈন্য পালাতে গিয়েও মারা পড়লো। এভাবে স্পেনিশদের অনেক সৈন্যই নিহত হলো। অক্ষত রইলো তারাই যারা নির্বিঘ্নে পালাতে পারলো। বিশাল এক অস্ত্রভাণ্ডার রেখেই ওরা পালালো।

মুক্তিসেনারা চলে যাওয়ার পর স্পেনিশ ক্যাম্পে লাশ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। স্পেনিশ সেনাবহিনীর হে কোয়ার্টারে এই সংবাদ পৌছার আগেই মুক্তিসেনারা তাদের গোপন ক্যাম্পে চলে গেলো।

এই গেরিলা অভিযান চালানো হয়েছিলো অস্ত্রের জন্য। সে প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেছে আপাতত।

মারাকেশের স্পেনিশদের দখলকৃত প্রদেশসমূহের জায়গায় জায়গায় ছোট বড় সেনা চৌকি ছিলো। আবদুল করীমের মুক্তিসেনারা রাতের বেলায় সেসব চৌকিকে চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে পিলে চমকে দেয়া সুরে এ ধরণের ঘোষণা দিতো,

'অস্ত্র সমর্পণ করে আমাদের কাছে চলে এসো। আর না হয় এখান থেকে জীবিত বের হতে পারবে না।'

এমন ঘোষণাও শোনা যেতো,

'আজকের রাতের পর যদি জীবিত থাকতে চাও এবং এই রাতটিই সর্বশেষ রাত মনে করে না থাকো, তাহলে কাল সকালে যেন এখানে আর একটাকেও দেখা না যায়।'

প্রতি রাতেই কোন না কোন সেনা চৌকির আশেপাশে এ ধরণের ঘোষণা শোনা যেতো। মরুর নিঃস্তব্ধ রাতে এমন আচমকা চিৎকার স্পেনিশদের কলজে কাঁপিয়ে দিতো। যেন এটা কোন অশরীরি অট্টহাসি।

এ ছাড়াও স্পেনিশ সেনাদলের এত বড় শক্তিশালী ক্যাম্পে মুক্তিসেনাদের অবিশ্বাস্য আক্রমণ ও জেনারেল সেলিষ্টারের মৃত্যু পুরো স্পেনিশ আর্মিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

এই আতঙ্ক ও রাতের বেলায় আচমকা গেরিলাদের ঘোষণার কারণে সকাল হতেই দেখা যেতো যে চৌকি খালি হয়ে গেছে। এভাবে অনেকগুলো সেনা চৌকি খালি হয়ে গেলো। কিছু কিছু চৌকিতে মুক্তিসেনারা রাতে গেরিলা হামলা চালিয়ে উন্নত প্রযুক্তির অনেক অস্ত্র হাতিয়ে নিলো।

আবদুর করীমের এবার মুক্তিসেনাদের নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল বাহিনীর নিয়মতান্ত্রিকতায় অভিজ্ঞ করে তুললো। তারপর গুপ্ত ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যথারীতি সম্মুখ সমরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। এখন আবদুল করীম তার হেডকোয়ার্টার 'রীফ' পাহাড় সারির গহীন অঞ্চলে সরিয়ে নিয়েছে। মুক্তিসেনারা এতদিনে স্পেনিশদের বেশ কিছু চৌকি ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল দখল করে নিয়েছে।

আবদুল করীম একদিন 'মিলীলা' নামক অনেক বড় একটি শহরের ওপর চড়াও হলো। শহরটি মারাকেশের অন্যতম কেন্দ্রীয় শহর। এখানে ফ্রান্স, স্পেনসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের অভিজাত লোকেরা বসবাস করে। বিত্ত ও প্রাচুর্যের এমন প্রদর্শনী এ শহরের মতো অন্য শহরগুলোতে খুব একটা দেখা যায় না। শহরের জনসংখ্যা চল্লিশ হাজার। আবদুল করীম শহর অবরোধ করলো। পুরো শহর মুক্তিসেনারা ঘিরে নিলো।

মারাকেশের যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষদের ভিটেবাড়ি ছিলো এই শহরে। এই মিলীলা শহরেই অনেকের শৈশব কেটেছে। ইউরোপীয়রা তাদেরকে তাদের ভিটেবাড়ি থেকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিসেনাদের মধ্যে নষ্টালজিক ছড়িয়ে পড়লো। সেটা ক্রমেই রূপ নিলো ভয়াবহ প্রতিশোধ স্পৃহায়। এমনকি মুক্তিবাহিনীর মধ্যে এমন একটা দাবীও উঠলো, এই শহরে ইউরোপের যত লোক আছে তাদেরকে হত্যা করে তাদের অঢেল ধনসম্পদ সব নিয়ে নিতে হবে। যেগুলো মারাকেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজে লাগানো হবে।

আবদুল করীম মুক্তিসেনাদের এই মনোভাবের কথা শুনে সবাইকে ডেকে এনে খুব সংক্ষেপে বললেন,

'আমাদের দৃষ্টি শুধু শহরের ওপর। শহরবাসীর ওপর নয়। এটা ঠিক যে,

এই নির্দয় বিধর্মীরা অনেক নিরপরাধ মুসলমানকে মশা মাছির মতো মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রম লুটে নিয়েছে। এত কিছুর পরও আমি শহরবাসীর ওপর হাত উঠাবো না। এটা সত্যিকারের কোন 'মর্দে মুজাহিদ' স্বাধীনতাকামী মুক্তিসেনার ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী যে, সে কোন নিরস্ত্র মানুষের রক্ত ঝড়াবে। মনে রাখবে, ইসলাম মানবতার শিক্ষা দেয়, শিক্ষা দেয় মহানুভবতার। তোমাদের উদার-মহানুভব আচরণ হয়তো হিংস্রপ্রাণীর মতো ওই মানুষগুলোকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করবে।'

এ ধরণের বক্তব্য দেয়ার পরও মুক্তি সেনাদের আবেদ-উত্তেজনা এবং চাপা ক্রোধ ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। এই প্রথম আবদুল করীম অনুভব করলো, তার হাতে গাড় এই দলটি তার কথা শুনতে চাচ্ছে না। ইউরোপীয়ানদের হত্যার দাবী এখনো তারা পরিত্যাগ করেনি।

আব্দুল করীম এতে খুব একটা বিচলিত হলো না। তাকে যে চিন্তাটা অস্থির করে তুললো। সেটা হলো, এই শহরে যুবতী মেয়েরাও রয়েছে। যা মুক্তিসেনাদের ঈমান-বিশ্বাসকে হালকা করে দিতে পারে। আর যে বৈভব আছে, তাতে তাদের এতদিনের লালিত বিশুদ্ধ সংকল্পে নাড়া দিয়ে যেতে পারে। নারী ও সম্পদের লোভ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধশক্তিকেও ভেতর থেকে ঘুণ পোকার মতো খেয়ে ফেলে।

আবদুল করিম দেখলো, শহর অবরোধ বেশ সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শহরের ওপর একযোগে হামলা চালালেই এখন শহর জয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। শহরবাসীদের সাহায্যে স্পেনিশ সেনারাও আসবে না কিংবা সেই সাহসও নেই তাদের। তাই শহর বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু তারপর তো তার মুক্তিসেনারা শহরবাসীদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। চরম প্রতিশোধ। বিজিত লোকদের ওপর প্রতিশোধের নেশায় চড়াও হওয়া ইসলাম কখনো সমর্থন করে না।

এসব সাত পাঁচ ভেবে আবদুল করীম অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিলো এবং অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে তার হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলো তার মুক্তিসেনাদের নিয়ে।

ইউরোপীয় ও অনেক বিধর্মী ঐতিহাসকিরা কেবল এই একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে আবদুল করীমকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তারা অকপটে স্বীকার করেছেন, আবদুল করীম চারিত্রিক, মানবিক, আদর্শিক ও নৈতিক এবং চরম বিবেকবোধের প্রতি তার দারুণ ভীষণ মুগ্ধ।

❖❖❖❖❖

তাই এই অসাধারণ আদর্শিক ব্যক্তিত্ববোধের প্রতি অনেক স্পেনিশ, ফ্রান্সীয় ও ইউরোপীয়ানরাও বিমুগ্ধ ছিলো। স্পেনিশ আর্মির এক সার্জেন্ট তো আবদুল করীমের নেতৃত্বগুণের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের দল ত্যাগ করে। তার নাম সার্জেন্ট কালাইমাস।

সার্জেন্ট কালাইমাস। বয়স সাতাইশ থেকে ত্রিশের কোঠায় হবে। স্পেনিশ আর্মিতে বেশ সুনাম ছিলো ক্লাইমাসের। আর কিছু দিন পরই পদোন্নতি হয়ে গেলে কর্ণেল হয়ে যেতো। সার্জেন্ট ক্লাইমাস স্পেনিশ ছিলো না। ইউরোপের অন্য কোন দেশের লোক ছিলো।

একদিন লুকিয়ে ছাপিয়ে সার্জেন্ট ক্লাইমাস স্পেনিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে পড়লো। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেই পাহাড়ি এলাকায় পৌছে গেলো। এখানেই কোথায় রয়েছে আবদুল করীমের মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প। মুক্তিসেনারা তাদের ক্যাম্প ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরদুরান্ত পর্যন্ত সতর্ক প্রহরায় থাকতো। এতগুলো সতর্ক চোখ এড়িয়ে মশা মাছিও ক্যাম্প এলাকায় ঢুকতে পারতো না।

সার্জেন্ট ক্লাইমাসকে ভবঘুরের মতো একা একা ঘুরতে দেখে মুক্তিসেনারা তাকে পাকড়াও করলো। তার ওপর একমাত্র এই সন্দেহই করার ছিলো যে, সে স্পেনিশ আর্মির গুপ্তচর। মুক্তিসেনারাও তাকে গুপ্তচর হিসাবেই গ্রেফতার করলো। তবুও ক্লাইমাস বললো,

'আমি আসলে তোমাদের জেনারেল আবদুল করীমের সঙ্গে সাক্ষত করতে এসেছি। জানি, তোমরা আমার একথা বিশ্বাস করবে না। আমাকে শত্রুদলের চর মনে করছো। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি স্পেনিশ আর্মিল লোক ছিলাম। এখন আর নই। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। অবশ্য আমার বক্তব্যের পক্ষে কোন প্রমাণও নেই আমার কাছে।'

ওরা সার্জেন্টের কথা বিশ্বাস করলো না। একজন তো বলেই ফেললো,

'ওই বেটা! সাদা চামড়া! আর চাপা মেরো না। তোমরা ইউরোপীয়ানরা মিথ্যা ছাড়া কথাই বলতে পারো না। তোমরা তো এদেশে এসেছিলে মারাকেশের নিরাপত্তা চুক্তির অধীনে। এর অর্থ তো ছিলো আমাদের মারাকেশের মুসলমানদের জীবন হবে শান্তি-সুখের। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের কীট বানিয়ে ছেড়েছো। আমাদের দেশ দখল করে নিয়েছো। ঘর-বাড়ি, টাকা-পয়সা, সুখ-শান্তি সব ছিনিয়ে নিয়েছো। এখন দেখো তোমাকে আমরা কি করে জাহান্নামের কীট বানাই।'

মুক্তিসেনাদের নিয়ম ছিলো, তাদের এলাকায় কোন গাদ্দার বা গুপ্তচর ধরা পড়লে তাকে জীবন্তু মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হবে। এজন্য তারা উপরস্থ কমান্ডারের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করতো না। সে নিয়ম অনুযায়ী তারা ক্যাম্পের কাছাকাছি একটা জায়গায় বড় করে গর্ত খুঁড়লো। এই গর্তের মধ্যে একজন মানুষকে সহজেই দাফন করা যাবে।

ঘটনাক্রমে সেখানে আবদুল করীমের নিকটস্থ এক কমান্ডার কোন এক কাজে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। গর্ত খুঁড়তে দেখে সৈনিকদের কাছে ঘটনা জানতে চাইলো কমাণ্ডার। তাকে জানানো হলো, স্পেনিশ আর্মির এই গুপ্তচরের জন্য গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। কমাণ্ডার সার্জেন্ট ক্লাইমাসের বক্তব্য শুনলো। ক্লাইমাস সৈনিকদের যে কথা বলেছিলো তাকেও একই কথা বললো।

কমাণ্ডার তার কথা শুনে অনুভব করলো, তাকে আবদুল করীমের কাছে একবার নিয়ে যাওয়া উচিত। সে আসলেই গুপ্তচর হলে সেখানেও তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। তা ছাড়া গুপ্তচর হলেও শক্ত জেরার মুখে মূল্যবান কোন তথ্যও তার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

তাকে আবদুল করীমের সামনে উপস্থিত করা হলো। আবদুল করীম তাকে জিজ্ঞেস করলো,

'কে তুমি? এদিকে এসেছো কেন? জানো না, এখানে ধরা পড়লে গুপ্তচরের অভিযোগে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে?'

'আমার নাম ক্লাইমাস'। সার্জেন্ট বললো, ' স্পেনীয় আর্মিতে সার্জেন্ট পদে ছিলাম। সার্জেন্ট হলেও মেজর কর্ণেলদের সঙ্গে আমার উঠাবসা ছিলো। কিন্তু আমাদের আর্মির লোকেরা এখানকার মুসলমানদের ওপর যে জুলুম অত্যাচার করেছে এবং দিন দিন তা যেহারে বেড়ে চলেছে, ওদের এই অমানুষিক-পৈশাচিক আচার-আচরণ আমার বিবেককে জাগিয়ে দিয়েছে। জীর্ণশীর্ণ মুসলমান বাচ্চাদেরকে স্পেনিশ অফিসারদের যেভাবে বেগার খাটাতে দেখেছি তা কোন পশুর পক্ষেও সম্ভব নয়। আট নয় বছরের ছেলে মেয়েদেরকে দিন রাত গাধার মতো খাঁটিয়ে এক বেলাও খাবার খেতে দেয় না ওরা।

'কত বাচ্চাকে আমি না খেতে খেতে মরে যেতে দেখেছি।

নিষ্পাপ মেয়েদের ওপর হিংস্র হায়েনার মতো ঝাপিয়ে পড়ে। তাকে ক্ষতবিক্ষত করে গুলি করে মেরে ফেলে। যাকে ইচ্ছে তাকেই ওরা গুলি করে মেরে ফেলে। মুসলমানদেরকে ওরা মানুষই মনে করে না। ওদের যে হিংস্রতা ও

পৈশাচিকতা আমি দেখেছি, তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। তোমরা বাইরে থেকে ওদের যে অমানুষিকতার কথা শোনা তা খুব সামান্যই শুনে থাকো।'

'আমার হাতেও অনেক হিংস্র কাজ করানো হয়েছে। গত কয়েক রাত থেকে আমি ঘুমুতেও পারছি না। ক্ষুধার যন্ত্রণার ও বর্বর-পিশাচদের অত্যাচারে যে শিশুগুলো চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের রক্তাক্ত মুখগুলো আমাকে ঘুমুতে দিচ্ছে না। আমার বিবেক আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। এত দিন পর আমার মৃত অনুভূতি-উপলব্ধি জেগে উঠেছে। আমাকে কুড়ে কুড়ে দংশন করছে। আমি এখন অনেকটা দিশেহারার মতো অবস্থায় পড়েছি। না হয় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসার সাহস পেতাম না কখনো।'

'অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যে ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া, ভালোবাসা, সহমর্মিতা নেই সেটা কখনো সত্য ধর্ম হতে পারে না। আমাদের খ্রিষ্ট ধর্মে তো 'গড' এর প্রতিও কাউকে বিশ্বাসী দেখা যায় না। তারা গীর্জা-চার্চ বানিয়ে রেখেছে মানুষকে দেখানোর জন্য। ওখানে কোন ইবাদত বা প্রকৃত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় না। যে পাদ্রীদের লোকেরা নিষ্পাপ বলে মনে করে তারা তো স্বার্থের সামান্য উপলক্ষ্যেই মিথ্যা বলে। মুসলমানদেরকে কি করে নাজেহাল করা যায়, কিকরে ধ্বংস করা যায়, তারা এ পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। একেই তারা ইবাদত মনে করে। মুসলমানদের ব্যাপারে কেউ কোনো ভালো কথা বললে, তার মুখ চেপে ধরে। এভাবে পাদ্রী, যাযকরা খ্রিষ্টের অনুসারীদেরকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হওয়ার শিক্ষা দান করেছে।'

'আমি শুনেছি তোমরা নাকি মালীলা থেকে এজন্য অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছো যে, শহর জয় করার পর সেখানকার ইউরোপীয় অধিবাসীদেরকে তোমাদের মুক্তিসেনারা নির্বিচারে হত্যা করবে। যা তোমাদের ধর্মে পাপ বলে মনে করে। অথচ তোমরা তা করলে আমরা খুব আশ্চর্যান্বিত হতাম না। কারণ, আমরা ইউরোপীয়ানরা যখন ওখান থেকে তোমাদেরকে বের করে দিয়ে তোমাদের ঘর-বাড়িগুলো দখল করে নিয়েছিলাম, তখন আমরাও এর চেয়ে নির্মম আচরণ করেছিলাম তোমাদের সঙ্গে। আমি যে বাড়িটিতে থাকতাম, সেটাও কোন মুসলমানের বাড়ি। বাড়িতে একটা পুরনো কুরআন শরীফ পেয়েছিলাম। একবার ভেবেছিলাম সেটা ফেলে দেবো কিনা। কিন্তু মন সায় দিলো না। সেটা যত্ন করে আমার আলমিরার ভেতর রেখে দিলাম।'

'এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে এ কারণেই হয়তো 'গড' আমার বিবেককে জাগিয়ে দিয়েছেন। তোমরা কি কারণে মালীলা থেকে অবরোধ উঠিয়েছো সেটা

শোনার পরই আমি আমাদের ধর্ম থেকে ফেরার হয়ে গেলাম। বহু কষ্ট করে অনেক অনুমান করে বের করেছি তোমাদের এ এলাকায় ক্যাম্প রয়েছে। আমি পায়ে হেঁটে এ পর্যন্ত পৌঁছেছি। এত মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ কিভাবে যে পাড়ি দিয়েছি তা জানি না। শুধু এতটুকু জানি, বিবেকের দংশনে কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'পাপের বিশাল এক পাহাড় আমার ওপর চেপে বসেছে। আমি সেটা নামাজে এসেছি। আমাকে সেই আলো দেখাও, যা আত্মজগতকে আলোকিত করে। যে আলো আমার ভেতরের অন্ধকারকে দূর করে দেবে। আর যদি আমাকে গুপ্তচর মনে করে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাও, তবে আগে আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিয়ো। যাতে আমি খোদার কাছে এমন পবিত্র মানুষ হয়ে পৌঁছতে পারি, যে তার সব পাপ থেকে তাওবা করে ধুয়ে মুখে পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

তার কথাগুলো দারুণ হৃদয় ছোঁয়া ছিলো। সেখানে আবদুল করীমের সঙ্গে যে কমান্ডাররা ছিলো তাদের মনে কথাগুলো ভীষণ দাপ কাটলো। তবে আবদুল করীমের মতো এমন তীক্ষ্ম দৃষ্টির এক কমান্ডার তার কথায় বেশ প্রভাবান্বিত হলেও সহসাই এ ফায়সালা করতে পারছিলো না যে, স্পেনীয় আর্মির এই সার্জেন্ট কোন গুপ্তচর নয়। বিচক্ষণ-দূরদর্শী কোন কমাণ্ডারের পক্ষে হঠাৎ করে কারো ব্যাপারে এমন নিশ্চিত ফায়সালায় পৌঁছা সম্ভব নয়। তাই আব্দুল করীম অনেকটা নির্বিকার কণ্ঠে বললো,

'দেখো সার্জেন্ট! তুমি যা কিছু বলেছো, তা সত্য না মিথ্যা সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আশা কর আমরা কোন ইঙ্গিত পেয়ে যাবো তোমার আসল পরিচয় সম্পর্কে। এখন আমরা যা করতে পারি তা হলো, তোমার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করে দিতে পারি। তুমি এখন আমাদের নজরবন্দি অবস্থায় থাকবে।'

তারপর আবদুল করীম নিজের সঙ্গেই রাখলো  সার্জেন্ট ক্লাইমাসকে। কারণ সে গুপ্তচর না হলে তার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়ার ছিলো। সে ক্ষেত্রে সে নিজেও কম মূল্যবান নয়। সে যেখানেই যেতো, যাই করতো তার ওপর সবসময় বার জোড় চোখ কঠিন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতো। সেটা এমন সন্তর্পণে যে, যে ছয়জন ছাড়া মুক্তিসেনাদের অনেক কমাণ্ডারও এ ব্যাপারে কিছু জানতো না।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এটা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, সার্জেন্ট ক্লাইমাস কোনো গুপ্তচর নয়।

ক্লাইমাস স্পেনিশ ও ফ্রান্সীয়দের ব্যাপারে অনেক অজানা তথ্য দেয়। তাদের সেনাবিন্যাস ও বিভিন্ন গুপ্ত স্কোয়াডের ব্যাপারে অভাবনীয় অনেক বিষয় আশয় তার কাছ থেকে জানা যায়। আবদুল করীমের মনে হলো, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ, এসব বিষয় কখনোই মুসলিম মুক্তিসেনারা জানতে পারতো না। এখন রণাঙ্গনের অনেক ক্ষেত্রে তড়িৎ ফায়সালা করাটা আবদুল করীমের জন্য সহজ হয়ে গেলো।

তারপর ক্লাইমাস গুপ্তচরবৃত্তির ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বও নিয়ে নেয় স্বেচ্ছায়। বেশ কয়েকটি নৈশ হামলায় দারুণ বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব দেখায়। ব্যক্তি হিসেবে ক্লাইমাস খুব অমায়িক ও সদালাপী। মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকে। এজন্য অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ক্যাম্পের সবার কাছে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। একদিন সে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং সবার সামনে মুসলমান হয়ে যায়। আবদুল করীম তার নাম রেখে দেয় হজ্জুল আয়মান।

❖❖❖❖❖

ইতিমধ্যে মারাকেশের মরু এলাকার কিছু মরুচারী গোত্র সরদার ও আবদুল করীমের মুক্তিসেনা দলে যোগ দেয়। এদের মধ্যে এক সরদার তো তার পুরো গোত্র ও পরিবারসহ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এই সরদারের নাম সাজিদ পারহী। সাজিদ পারহীও বেশ সদালাপী মানুষ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে হজ্জুল আয়মানের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে উঠে।

হজ্জুল আয়মান (সার্জেন্ট ক্লাইমাস) দেখতে বেশ সুদর্শন ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর সে খুব নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে যায়। অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে তাকে ইসলামী বিধি-বিধান পালনে বেশ যত্নবান দেখা যায়।

এই মাস দুয়েকের মধ্যে তার দাঁড়িও বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। আগেই আয়মানকে বেশ সুদর্শন লাগতো। এখন ঘন চাপদাড়িতে আরো সুদর্শন লাগে।

গোত্র সরদার সাজিদ সারহীর কাছে হজ্জুল আয়মানকে এতই ভালো লেগে গেলো যে, তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলো। মুক্তি সেনাদের হেডকোয়ার্টার থেকে তার বাড়ি মাইল খানেক দূরে। সাজিদ সারহী আবদুল করীমকে একদিন বললো,

'ভাই আবদুল করীম! তোমাদের এই নওমুসলিম হজ্জুল আয়মানকে আমার বেশ ভালো লেগেছে। আমি চাই ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে অতিথি হিসেবে রাখতে। ও আমাদের চেয়েও পাক্কা মুসলমান হয়ে উঠছে। ওর মতো একজন মানুষের সেবা করতে পারাও ভাগ্যের ব্যাপার।'

'এতো খুব ভালো প্রস্তাব! তোমার এ কথায় আমার ইসলামের প্রথম যুগের আনসার সাহাবীদের কথা মনে পড়ে গেলো। আনসার সাহাবীরা এভাবে মুজাহিরদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তবে হজ্জুল আয়মান স্বতস্ফূর্তভাবে তোমার মেহমানদারি গ্রহণ করে কিনা সেটাও যাচাই করে নিয়ো।' আবদুল করীম বললো।

সাজিদ সারহীর প্রস্তাবে হজ্জুল আয়মানে প্রথমে তার বাড়িতে এভাবে যেতে মৃদু আপত্তি করলেও আবদুল করীমের কথায় তার সে আপত্তিও কেটে গেলো।

এখন দিনের বেলায় হজ্জুল আয়মান ক্যাম্পে চলে আসে। কাজ শেষ করে বিকালে বা সন্ধ্যায় সরদার সারহীর বাড়িয়ে চলে যায়।

সাজিদ সারহীর একটি মাত্র মেয়ে সন্তান। জুমানা সারহী। অপরূপ সুন্দরী। নিজেদের মাতৃভাষা টুকটাক ইংরেজি, ফ্রান্স ও স্পেনিশ ভাষাও বুঝে। বলতেও পারে। তো জুমানা সাহরী বেঁকে বসলো। সে তার বাবা সাজিদ সারহীকে বললো,

'বাবা! তুমি কিভাবে এক ইউরোপিয়ানকে ধরে নিয়ে এলে?'

'আহ মা!' সাজিদ বললো, 'আস্তে কথা বলো।'

'এখান থেকে চিৎকার করে কথা বললেও ওই সাদা চামড়া আমার কথা শুনতে পাবে না। কারণ, সে এখন এখানে নেই। তোমাদের ক্যাম্পে ফিরে গেছে।'

'এই ছেলে তো এখন শুধু ইউরোপীয়ান নয়, সে মুসলমান হয়ে গেছে। সে স্পেনিশ আর্মির সার্জেন্ট ছিলো। আমাদের কমাণ্ডার আবদুল করীমের আদর্শ তাকে মুগ্ধ করে। এজন্য সে এখানে এসে মুসলমান হয়ে যায়।'

'কোন খাঁটি মুসলমানকে এভাবে স্থায়ী মেহমান হিসেবে আনতে পারলে না?'

'সেই ছেলে হুজ্জুল আয়মান শুধু খাঁটি মুসলমান না, আমাদের চেয়ে ভালো মুসলমান।

'ছাই মুসলমান! আমরা জন্ম থেকে মুসলমান হয়েও খাঁটি মুসলমান হতে পারলাম না। আর সে দু'দিনেই খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলো! শোন বাবা! তোমার মনে রাখা দরকার, এ লোক খ্রিষ্টান ছিলো। এরা মুসলমানের চিরশত্রু। মুসলমানদের জন্য এরা বিষধ সাপের চেয়ে ভয়ংকর। সাপকে দুধ কলা দিয়ে পুষলেও সে সুযোগ পেলেই ছোবল মারে, দংশন করে। এই লোকও দেখবে এক সময় তার ফণা তুলে তোমাদেরকে ছোবল মারছে।

'মানুষ আর সাপ কি এক মা!' সাজিদ সারহী খুব নরম গলায় বললো, 'সাপের জন্মই হয় হিংস্রতা নিয়ে। আর মানুষ কল্যাণ ও শুভবার্তা নিয়ে পৃথিবীতে

আসে। তারপর মা-বাবা, পরিবার বা প্রতিবেশী কিংবা পরিবেশের কারণে সে মুসলমান, ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোন ধর্মালম্বী হয়। কেউ জন্ম থেকে মুসলমান হলেই খাঁটি মুসলমান হতে পারে না, তার ঈমান ও কর্মকাণ্ড ঠিক না করলে। দেকা যায় একজন মুসলমান সারা জীবন তার ঈমান আমল ঠিক না করার কারণে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারে না। আবার একজন ঘার নাস্তিক বিশুদ্ধ ঈমান-বিশ্বাস নিয়ে মুসলমান হয়ে সঠিক নিয়মে ইবাদত-বন্দেগী করে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে খাঁটি মুসলমান হয়ে যেতে পারে অল্প সময়েই। মুসলমান বা খাঁটি মুসলমান হওয়া পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত কোন বিষয় নয়। এটা কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। যেটা অধিকাংশ মুসলমানই অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই আজ দুনিয়ায় সত্যিকার মুসলমানের সংখ্যা কমে গেছে।'

'দেখো না মারাকেশ সেই কবে দখলদাররা দখল করে নিয়েছে। কোন মুসলমান কি এতদিন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে? মুসলমানরা শুধু মারই খেয়েছে। যেন মার খাওয়াই মুসলমানদের কাজ! মুসলি নারীদের সম্ভ্রম লুটতে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব? এটা সম্ভব হয়েছে মুসলমানদের ঈমান অতি দুর্বল হওয়ার কারণে। আজ মুসলমানরা সবখান থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। ঈমান দুর্বল হওয়াতে এক মুসলমান আরেক মুসলমানের প্রতি কোন দায়বোধ করে না। কোন সহমর্মিতা পোষণ করে না। বিশ্বাস ও ভরসা রাখে না। এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে প্রতিপক্ষ মনে করে। যেমন তুমি এই বেচারা আয়মানকে সহ্য করতে পারছো না।

'দেখো বাবা! তুমি আমার ঈমান দুর্বল বলতে পারো। আমল মন্দ বলতে পারো এবং আমাদের ঈমান যে খুব শক্তিশারী না তাও আমি স্বীকার করবো। কিন্তু একজন মুসলমানকে সহ্য করতে পারছি না একথা তুমি বলতে পারো না। আমি এত খারাপ মেয়ে নই। ওই লোককে তো সামনাসামনি দেখিইনি। দূর থেকে দেখেছি। তাও অনিচ্ছাকৃত। একজন মেয়ে হিসেবে তাকে দেখলে আমার মনে হয় যে কেউ পছন্দ করবে। কিন্তু কোন ইউরোপীয়ান দেখলে আমার মনে পড়ে যায়, মুসলমানদের প্রতি তাদের হিংস্র আচরণের কথা। তাই তুমি যত কথাই বলো মুসলমান হিসাবে তাকে আমার এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।' জুমানা সারহী বললো।

'দেখো জুমানা! আমাদের কমান্ডার আবদুল করীম কী বলেছে জানো? সে সবসময়ই একথা বলে যে, এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের যদি ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে, তাহলেই মুসলমানরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে

পারবে। আর এ সম্পর্ক গড়ে উঠবে একমাত্র ঈমান ও আমলের সূত্র ধরে। যখন মুসলমানদের মধ্যে এ জিনিসটা ছিলো, তখন মুসলমানরা বিশ্ব শাসন করেছে।'

'হাজার হাজার মাইল দূরের সেই ভারতের সিন্ধু থেকে এক অসহায় নারী চিঠি পাঠিয়েছিলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে। সেই মাজলুমা নারীর ডাক শুনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ছুটে এসেছিলেন ভারত বর্ষে। তারপর ভারতবর্ষ অর্থাৎ পুরো উপমহাদেশ জয় করেন। শুধু কি তলোয়ারের জোরে? অধিকাংশ বিজয়ই অর্জন করেছিলেন বিনা রক্তপাতে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু তখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম যদি তাদেরকে হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার কারণে দূরে সরিয়ে দিতেন, বুকে তুলে না নিতেন, তাহলে কি অবস্থা হতো বিশ্ব মুসলিমের? তাই জুমানা! বুঝতে চেষ্টা করো। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা আমাদের শত্রু ঠিক; কিন্তু তারা মুসলমান হয়ে গেলে আমাদের বন্ধু হয়ে গেলো।'

সরদার সাজিদ সারহী এমনিতে বেশ আবেগী মানুষ। তবে একসময় ধর্মকর্মের খুব একটা মনোযোগী ছিলো না। আবদুল করীমের সান্নিধ্যে এসে তার জীবন আমূল পাল্টে যায়। এই চেতনা সে তার গোত্রের মধ্যে বিপ্লব আকারে ছড়িয়ে দেয়। এজন্য তার সঙ্গে তার গোত্রের লোকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিসেনায় যোগ দেয়। তবে আজ সাজিদ সারহীকে যেন কথায় পেয়েছে। তার মেয়ে জুমানা এটা বুঝতে পারলো। তাই তার বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললো,

'ঠিক আছে বাবা! তুমি যা বলেছো সবই ঠিক। তোমার সেই হুজ্জুল আয়মান সাহেবও ভালো মানুষ। তাকে আমি খাঁটি মুসলমান হিসেবে মেনে নিচ্ছি। তবে তাকে বুঁকে তুলে নিতে পারবো না। সে তোমার বুকেই থাক। একথা বলে ফিক করে হেসে ফেললো জুমানা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সাজিদ সারহী দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটি তার বেশ জেদি হয়েছে। তবে ওর সুন্দর একটা মনও আছে। ইসলামের প্রতিও তার দায়বোধ আছে। কিন্তু আয়মানের প্রতি যে কেন এমন বিরূপ মনোভাব সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না সাজিদ সারহী।

এর দু'দিন পর রাতে এক স্পেনিশ চৌকিতে গেরিলা হামলার কথা। গেরিলা দলে সাজিদ সারহী ও হুজ্জুল আয়মানও নাম লিখিয়েছে। গভীর রাতে দলটি স্পেনিশ চৌকিতে আক্রমণ চালালো। চৌকিতে শ'তিনেক আর্মি ছিলো। চৌকির চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত কড়া প্রহরা বসিয়ে রেখেছিলো স্পেনিশরা। গেরিলা

দলে স্পেনিশ চৌকির অনেক দূর থেকেই অতি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকে। এ কারণে প্রহরায় থাকা স্পেনিশ আর্মিরা টের পায়নি কিছুই।

টের পায় তখনই যখন পেছন থেকে ছোরা বা খঞ্জরবিদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু এরপর তো আর কিছুই করার কথা নয়। এভাবে একে একে সতের জন আর্মি প্রহরীকে নিঃশব্দে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে চৌকিতে হামলা চালায় গেরিলারা।

ভেতরের স্পেনিশ সেনারা তো জানে বাইরে নিশ্চিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা আছে। কোন চিন্তা নেই। কিছু ঘটলে প্রহরীদের কাছ থেকে আগাম সংবাদ পেয়ে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারবে। সেই ভেবে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিলো। তাই ঘুমের তিনভাগের এক ভাগ সৈন্য খতম হয়ে যায়। যারা ঘুম থেকে জাগতে পারলো তারা চরম আতঙ্ক ও ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলো। অনেকে সামলে উঠে লড়তে চেষ্টা করলো। কেউ কেউ আবার পালাতে চেষ্টা করলো।

পালাতে গিয়েও কিছু মারা পড়লো। যারা লড়তে চেষ্টা করলো, তারা এলোপাথারি গুলি ছুড়ছিলো। তাই তাদের গুলির টার্গেট নিজেদের লোকরাই হতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে অধিকাংশ স্পেনিশ আর্মিই নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগলো।

হুজ্জুল আয়মান অর্থাৎ সার্জেন্ট ক্লাইমাস পলায়নরত এক স্পেনিশ অফিসারকে মাত্র যমের বাড়ি পাঠিয়েছে, অমনি তার কানে ভেসে এলো পরিচিত কণ্ঠের এক চিৎকার। আওয়াজটা এসেছে ডান দিক থেকে। সেদিকে তাকিয়ে দেখলো, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ দূরে একটা তাঁবুর পেছন দিকে সাজিদ সারহীকে দুই স্পেনিশ ধরে রাইফেলের বাট দিয়ে মারছে।

আয়মান মুহূর্তের মদ্যে সেখানে পৌঁছে গেলো। গুলি না চালিয়ে একজনকে সজোরে কোমরে লাথি মারলো। লাথি খেয়ে ঘোঁত করে পড়ে গেলো সৈন্যটি। সঙ্গে সঙ্গে পাশের জনকেও একই কায়দায় লাথি চালালে। রাইফেল ফেলে সেও পড়ে গেলো। মাটিতে পড়েই দুই চিৎকার জুড়ে দিলো, 'ক্লামাসকে পাওয়া গেছে। ক্লাইমাসকে পাওয়া গেছে।'

স্পেনিশরা ক্লাইমাস ফেরার হয়ে যাওয়ার পর তাকে জীবিত ধরতে অনেক চেষ্টা করে। তারপর ঘোষণা দেয়, যে তাকে জীবিত বা মৃত ধরতে পারবে, তাকে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

এ কারণেই দুই স্পেনিশ মৃত্যুর মুখে পড়েও যখন ক্লাইমাসকে চিনতে পারলো, তখন দশ লক্ষ টাকার লোভ দু'জনের মৃত্যুভয় দূর করে দিলো। তারা

'ক্লাইমাস' বলে চিৎকার করতে লাগলো। অন্যান্য স্পেনিশ আর্মিরা তো যে যেভাবে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। কারো দিকে কারো কোন খেয়াল নেই। তবে দু'জনের চিৎকার শুনে একজনকে দৌড়ে এদিকে আসতে দেখা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তার বুক লক্ষ করে গুলি চালালো ক্লাইমাস ওরফে আয়মান। দেরি না করে পড়ে থাকা দু'জনকেও চিরদিনের জন্য চুপ করিয়ে দিলো।

তারপর রাইফেল রিলোড করে ককেয় মিনিট অপেক্ষা করলো কেউ এ দিকে আসে কি না। না, আর কেউ এলো না। তারপর মনোযোগ দিলো সাজিদ সারহীর দিকে। আর সাজিদ পড়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। তার মাথা ও মুখ রক্তাক্ত। রাইফেল দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছে।

আয়মান ডাকলো তাকে 'সরদার.... সরদার! কি অবস্থা তোমার?'

'পানি... পানি.. আমার মেয়ে, জুমানা... তারপর তার কথা বন্ধ হয়ে গেলো।

আয়মান দ্রুত নাড়ি পরীক্ষা করলো। নাড়ি চলছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। মশালের আবছা আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। স্পেনিশ এই ক্যাম্পটি এখন মুক্তিসেনাদের গেরিলা ইউনিটের দখলে। জীবিত কোন স্পেনিশ আর্মিকে দেখা যাচ্ছে না। অগণিত স্পেনিশ আর্মির লাশ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। কিছু আহত আর্মি গোঙাচ্ছে, কাতরাচ্ছে। গেরিলারা আহতদের উঠিয়ে নিচ্ছে। নিজেদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে এদেরকে সুস্থ করে তোলা হবে যুদ্ধবন্দি হিসাবে।

আয়মান এক গেরিলাকে ডেকে আনলো। দু'জনে মিলে সাজিদ সারহীকে উঠিয়ে নিলো।

ক্যাম্পে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর সাজিদ সারহীর জ্ঞান ফিরে এলো। মাথার ডান দিকে কানের নিচে আঘাত করা হয়েছে। সে জায়গাটা প্রায় থেতলে গেছে। সেখান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছিলো। শল্য চিকিৎসক এক ধরনের পাউডার দিয়ে রক্ত ঝড়া বন্ধ করে দিলো। মুখেও ঔষধ দিলো। তারপর মধুযুক্ত দুধ পান করানো হলো। এতে সরদারের ফ্যাকাশে চেহারায় কিছুটা প্রাণ ফিরে এলো। সেখানে আবদুল করীমও ছিলো। আবদুল করীম হুজ্জুল আয়মানকে বললো,

'আয়মান! সরদারকে তুমি বাড়ি নিয়ে যাও। তুমিও দু'তিন দিন বিশ্রাম নিয়ো। সরকারের প্রতিও খেয়াল রেখো। ওর যখম মারাত্মকই বলা যায়। তবে ওর শরীর বেশ শক্ত। দেখছো না একটা চুলেও পাক ধরেনি! তাই আশা করা যায়, ওর যখম তাড়াতাড়িই শুকিয়ে যাবে। যখম শুকিয়ে গেলেও হপ্তাখানেক বিশ্রামে যেন থাকে।'

'আকি কাল বাদে পরশুও সুস্থ হয়ে যাবো।' সরদারের দুর্বল কণ্ঠেও জযবার

উত্তাপ টের পাওয়া গেলো। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না কমান্ডার! স্পেনিশরা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গেছে। এটা শুধু মনে রোখো।'

'চমৎকার, চমৎকার সরদার! আবদুল করীম খুশি হয়ে বললো। 'তুমি পরশু কেন? আজই তো সুস্থ হয়ে গেছো। তবে সেটা মানসিকভাবে। দৈহিকভাবে সুস্থ হতে হপ্তা দেড়েকের কম লাগবে না। তাই ততদিন নিজের আবেগ-জযবাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে'। ... আব্দুল করীম তারপর হুজ্জুল আয়মানের দিকে ফিরে বললো, 'আয়মান! আর দেরি করো না। সরদারকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

'কি করে বাবার এ অবস্থা হলো?' জুমানা তার বাবার মাথায় এত বড় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে প্রায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যখম বেশি গুরুতর নয়। হপ্তাখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।' আয়মান নিচু স্বরে বললো জুমানাকে।

কারণ সাজিদ সারহীকে বিছানায় শোয়ানো মাত্রই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। এটা ঔষধের প্রতিক্রিয়া।

জুমানা তাকে আবারো জিজ্ঞেস করলো, তার বাবার এ অবস্থা কি করে হয়েছে? আয়মান সংক্ষেপে জানালো, গেরিলা হামলা ও সেখানে সরদারের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। ডাক্তার কি বলেছে, কি ঔষধ দিয়েছে এবং আবদুল করীম কী বলে দিয়েছেন সেসব কথাও বললো আয়মান। শুধু বাদ দিলো, সে যে নিজের একক প্রচেষ্টায় সরদারকে বাঁচিয়েছে সে প্রসঙ্গ।

জুমানা আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখমুখ ফুলে গেছে। উজ্জ্বল লাল আভা পুরো চেহারায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে তার মুখের স্বর্গীয় রূপ আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। রূপের এমন নিষ্পাপ বৈচিত্র আয়মান মনে হয় আর কোন দিন দেখেনি। তার মধ্যে এক অদ্ভূত অনুভূতি হলো।

একবার তার কাছে মনে হলো, কারো সৌন্দর্যে এভাবে মুগ্ধ হলো প্রশংসাসূচক দু'একটা বাক্য তাকে বলতে হয়। পরক্ষণেই মনে হলো, এতো ইউরোপীয়ান রীতি। তার বাড়ি পশ্চিম জার্মানিতে। জার্মানিদের মধ্যে এ রীতির প্রচলন আছে। সে তো এখন মুসলমান। এ সুন্দরী অপ্সরীও একজন মুসলমান। তাকে কি বলা যায়? কিংবা আদৌ কিছু বলা উচিত কি না ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলো না আয়মান। জুমানা তখনো তার বাবার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার ফোলা চোখ দুটো ছলছলে।

আয়মানের তখনই মনে পড়লো, আরে তাকে তো এ ব্যাপারে পরিষ্কার একটা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেটা চমৎকার এবং সবচেয়ে নিরাপদ সামাজিক রীতি। এর মধ্যে দারুণ মানষিক আবেদনও আছে। আছে শালীন-সভ্য আদর্শ।

সেটা হলো, কোন নারীর দিকে ইচ্ছে করে তাকাতে নেই। এমনকি নির্দোষ দৃষ্টিতে তাকাতে নেই। আর কাম-দৃষ্টিতে তাকানো তো সরাসরি পাপ। অসভ্যতাও। ইসলাম এক শালীনতা বিবর্জিত একটা অপরাধ বলে গণ্য করেছে। কোন নারীর দিকে চোখ পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া উচিত। দ্বিতীয়বার আর তাকানো উচিত নয়। প্রথমবার যে অনিচ্ছায় বা কোন বিশেষ প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এটা দোষণীয় কাজ হিসাবে গণ্য হবে না। এজন্য পাপও হবে না। তবে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করাটা দোষণীয় এবং এজন্য পাপও লেখা হবে।

হুজ্জুল আয়মানের একথাটা মনে পড়তেই তার ভেতরটা কেঁপে উঠলো। সে সঙ্গে সঙ্গে জুমানার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো।

এখন রাতের শেষ প্রহর চলছে। ভোর হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। সরদার অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মুখেও যন্ত্রণার ছাপ নেই। এর অর্থ হলো, ঔষধ বেশ ভালো কাজ করেছে। এখন আর এখানে না থাকলেও চলবে। ডাক্তারের কথামতো সরদারের ঘুম দুপুরের আগে ভাঙ্গবে না।

'ইয়ে... শুনুন!' আয়মান ইতস্তত করে বললো জুমানাকে এবং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, 'আপনি গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমি উনার পাশে বসছি। এখন আর উনি ঘুম থেকে উঠবেন না।'

জুমানার চোখ এড়লো না, আয়মান তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে। আয়মান ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেদহীন শরীর। ছয় ফিটের মতো লম্বা। বয়স কত হবে? ত্রিশ বত্রিশ। তার বাবার সামনে যখন দাঁড়িয়ে ছিলো আয়মান, তখনই জুমানা লক্ষ্য করেছে, একে নিঃসন্দেহে সুঠামদেহী সুপুরুষ বলা যায়। ইউরোপীয়ান হলেও দেহবর্ণ এতটা শ্বেতকায় নয় যে, চোখে রাগে। এর মধ্যে বাদামী বর্ণের ছোঁয়া আছে।

আয়মান যে জুমানার প্রতি সশ্রদ্ধ-সম্ভ্রমপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করে ওভাবে দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, এটা জুমানার কাছে ভালো লাগলো। তার মনের অজান্তেই কৃতজ্ঞতার একটা ধারা তাকে নাড়া দিয়ে গেলো। এই প্রথম তার মনে হলো, এ লোকটির প্রতিই এত দিন জুমানা এক ধরনের তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোশণ করে রেখেছিলো। এটা মনে হয়, ঠিক ছিলো না। বেশি সময় এভাবে নিরুত্তর থাকাও যে ঠিক নয় এটাও তাকে তাড়া করলো। তাই খুব নরম গলায় বললো,

'ইয়ে... আয়মান সাহেব! বরং আপনি গিয়ে শুয়ে পড় ন। আমি তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আমার ঘুম প্রায় হয়ে গেছে। আপনি তো বড্ড ক্লান্ত। রাতভর লড়াই করেছেন। তারপর এমন যখমী একটা মানুষকে এতদুর বয়ে নিয়ে এসেছেন। ধকল তো কময় যায়নি। ফজর হতে এখনো বেশ সময় বাকি। এতটুকু সময় বিশ্রাম করুন গিয়ে। ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকি।'

'না, ধন্যভাদ! এখন ঘুমুলে ফজরের সময় আর উঠতে পারবো না। ঠিক আছে, আপনি এখানে বসে থাকুন। আমি বাইরে গিয়ে বসি।' একথা বলতে বলতে আয়মান বাইরে চলে গেলো।

'না, আপনি ভেতরেই বসুন। বাইরে কুয়াশা পড়ছে' ... এতটুকু বলে জুমানা বুঝতে পারলো ঘরের ভেতর সে লোকটি আর নেই। তার মুখ খোলার আগেই বাইরে চলে গেছে।

জুমানা চেয়ার থেকে উঠ আলতো পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। বাইরে উঁকি দিলো। ভোরের আবছা আলোয় দেখতে পেলো, ঘরের সামনের টিলার ওপর একটা মানুষের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। মানুষটি বসে আছে। জুমানা আবার ঘরের ভেতর চলে গেলো। চেয়ারে বসে পড়লো। তার বাবা একটু নড়ে উঠলো এ সময়। পাশ ফিরতে চাচ্ছে। জুমানার সাহায্যে ঘুমন্ত অবস্থাতেই পাশ ফিরলো ডান দিকে। চোট পেয়েছে মাথার বাম দিকে।

জুমানা লক্ষ্য করলো, তার বাবার ঠোঁট দুটি নড়ছে। কিন্তু একটা বলছে হয়তো। তার মুখের কাছে জুমানার কান নিয়ে গেলো। তার বাবা বিড় বিড় করছে,

'আয়মান! ... আ... আ.. জু.. জুমানকে ... দেখো'... দু'বার এমন বিড় বিড় করেই তার বাবা আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো।

জুমানা বুঝতে পারলো, হামলার সময়ের ভয়াবহ কোন দৃশ্য মনে হয় স্বপ্নে হানা দিয়েছে। কিন্তু আয়মানের কথা যে বললো তার বাবা সেটার কারণ কী? তাহলে কি আয়মানই হামলাকারীদের হাত থেকে তার বাবাকে বাঁচিয়েছে? কিন্তু আয়মান তো ঘটনা বলার সময় একবারও তার ভূমিকার কথা বলেনি! এর রহস্য কী?

বাইরের প্রকৃতি আলো আঁধারিতে বেশ বৈচিত্র্যময়। এর মধ্যে আবার কুয়াশার হালকা চাদর খণ্ড খণ্ড ভাবে চারদিক আলতো করে ঢেকে রেখেছে। গ্রীষ্মের শেষ দিক এখন। পাহাড়ি এলাকাহওয়াতে এখানে এভাবে এসময় কুয়াশা পড়ছে।

সরদারের বাড়িটি মাঝারি ধরনের একটি পাহাড়ের নিচে। এই পাহাড়ের আশেপাশেই তার গোত্রের লোকেরা বসবাস করছে। পাহাড়ের ডানে-বামে ও সামনের দিকে উঁচু নিচু বেশ কিছু টিলা রয়েছে। দু'একটি টিলা শিলাপাথরের। একেবারে ন্যাড়া, তৃণ লতাহীন। আর অন্যগুলো বৃক্ষলতার ছাওয়া। দারুন সবুজ। অপরূপ দৃশ। কুদরত যেন নিজ হাতে এখানে নিসর্গকে সাজসজ্জা পরিয়েছে। আয়মানের কাছে জায়গাটি বেশ লাগে।

বাড়ির সামনের একটি টিলার চূড়ায় গিয়ে বসলো আয়মান। এসময় এখানে এসে বসার কোন অর্থ নেই। আয়মান বসতোও না। আসলে একটু নির্জনতার ছোঁয়া পাওয়ার জন্য আয়মানের মন উস্‌খুস্‌ করছিলো। গত কয়েক মাসে ওর জীবনে যা কিছু ঘটেছে গত একত্রিশ বছরের জীবনের অতীতের সঙ্গে যেন এর কোন তুলনাই হয় না।

স্পেনিশ কাম্প থেকে ফেরার হয়ে মুসলিম ক্যাম্পে আসা, এখানে এসে মুসলমান হয়ে যাওয়া, আবদুল করীমের সান্নিধ্যে নিজের স্পেনিশ আর্মির বিরুদ্ধে লড়াই করা। তারপর এই সরদার সাজিদ সারহীর সঙ্গে পরিচয়-ঘনিষ্টতা, অবশেষে সরদারের আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার মেয়ে জুমানার মুখোমুখি হওয়া- এসবকিছুই যেন ওর কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে।

আর এখন ওর মনে জুমানার অস্তিত্ব এসবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। ওর আগের জীবন হলে জুমানা খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ছিলো না। কারণ আয়মানের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সে রক্ষণশীল বলে পরিচিত ছিলে। মদ ও নারীর ব্যাপারে ও খুব সংযমী ছিলো। তারপরও ওর গোটা চারেক মেয়ে বন্ধু ছিলো। ওরাও কারো চেয়ে কেউ কম সুন্দরী ছিলো না। কিন্তু ওদের সঙ্গে জুমানাকে কোনভাবেই যেন মেলানো যায় না। হঠাৎ জলোচ্ছাস যেমন মুহূর্তেই সবকিছু ভাসিয়ে দিয়ে হঠাৎ করেই আবার নেতিয়ে পড়ে। ওদের প্রেম, ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস এমন হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের মতোই।

আর জুমানাকে গভীর কোন জলপ্রপাত বা বিশাল কোন দীঘির সঙ্গেই তুলনা করা যায়। যার মধ্যে আনন্দময়ী তরঙ্গ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আছে প্রবাহের অবিরত ধারা।

আয়মান ভাবছে, যত কিছুই হোক এমন নির্জনে এবং সহানুভূতির একটা পরিবেশে এমন একটা মেয়েকে পেয়ে কেউ সুযোগ নিতে ছাড়তো না। কমপক্ষে দুটো ভালো লাগার কথাও বলতো। দীর্ঘ সময় তার সঙ্গ উপভোগ করতো। আয়মান যে তা করেনি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে, এটা তার জীবনে

একটা অভাবিত ঘটনা। সন্দেহ নেই, ইসলামই তার মধ্যে এই অমিত শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে।

আয়মানের মধ্যে হঠাৎই আরেক প্রশ্ন জেগে উঠলো, সরদারের বাড়িতে সরদার ছাড়া তার একমাত্র মেয়ে, একজন গৃহপরিচারিকা ও দু'জন কাজের লোক- এ ক'জনই সদস্য। ওরা থাকে বারি বাইরে ভিন্ন কোঠায়। সরদার ও তার মেয়ে থাকে বাড়ির ভেতরে। আয়মানের জন্যও বাড়ির ভেতরই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকগুলো রুম রয়েছে বাড়ির ভেতরেও। এখানে একজন কেন নিয়মিত কয়েকজন অতিথি এতে থাকতে পারে। কিন্তু এমন একটা মেয়ে থাকতে আয়মানের কি এখানে একা একা থাকাটা ঠিক?

অবশ্য ওর প্রতি সরদারের শতভাগ আস্থা আছে। কিন্তু ওর নিজের প্রতি নিজের আস্থা কতটুকু? না, ওর আর এখানে এভাবে থাকাটা ঠিক হবে না। সরদারের অবস্থা একটু ভালো হলেই ও ক্যাম্পে থাকা শুরু করবে।

❖❖❖❖❖

বেলা এগারটা নাগাদ সরদারের ঘুম ভাঙ্গলো। জুমানা তার বাবার মাথার কাছের চেয়ারে বসা ছিলো। তার বাবাকে নড়তে দেখে এবং চোখ খুলে তাকাতে দেখে উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলো,

'বাবা! এখন কেমন লাগছে?' জুমানা বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেললো।

'ঘাড়ডিয়োনা বেটি! আমি এখন অনেকটাই সুস্থ্। শুধু মাথার বাম দিকটা একটু চিনচিনে ব্যথা আছে।' বলতে বলতে সরদার উঠে বসলো।

'আরে উঠছো কেন? যখমের ক্ষতি হবে তো?'

'কিছুই হবে না মা! শোয়ার চেয়ে বেস থাকতেই ভালো লাগছে।'

জুমানা লক্ষ্য করলো, আসলেই তার বাবাকে এখন অনেকটাই সুস্থ লাগছে। আগেই স্যুপ বানিয়ে রেখেছিলো। সেটা যত্ন করে তার বাবাকে খাইয়ে দিলো। তারপর দুধ মধু মিশ্রণে ঔষধ খাইয়ে দিলো।

'বাবা! এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ মা! এখন বেশ চাঙ্গা বোধ করছি। জুমানা! আয়মান কোথায়?'

'সম্ভবত ক্যাম্পে চলে গেছে।'

'সেকি? ওকেও তো কমান্ডার দু'একদিন বিশ্রামে থাকতে বলেছে। তাহলে ক্যাম্পে চলে গেলো কেন? তুমি ওর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেছো?'

'সে কি বাবা! আমাকে তুমি এত অভদ্র মেয়ে মনে করো?' আহত গলায় বললো জুমানা।

'না, মানে তুমি একদিন ওর ব্যাপারে অনেক অভিযোগ করেছিলে।'

'তখন তো ওর ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। তা ছাড়া আজ তো আর কোন অভিযোগ করিনি।'

'তাহলে মা! এখন ওর ব্যাপারে কি জানতে পেরেছো?'

' কেন তুমিই তো সেদিন ওর ব্যাপারে লম্বা বক্তৃতা দিলে। আর কাল রাতে ও যে যত্ন নিয়ে তোমাকে এখানে এনে শুইয়ে দিয়েছে, তোমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করেছে এবং আন্তরিকতা দেখিয়েছে এটা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ।' শেষের কথাগুলো জুমানা লাজুক কণ্ঠে বললো।

'হ্যাঁ, আমি অনুমান করেছিলাম তুমি নিজেই একদিন ওর ব্যাপারে প্রশংসার সার্টিফিকেট দেবে।' সরদার সাজিদ সারহী খুশি হয়ে বললো, 'কিন্তু আসল ঘটনা শুনলে না জানি কোন সার্টিফিকেট দেবে।'

'আসল ঘটনা?' জুমানা ভ্রু কুচকে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, ঘটনা হলো, কালকের গেরিলা হামলায় যদি আয়মান না থাকতো এবং ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎের মতো ছুটে না যেতো তাহলে হয়তো তোমার বাবা লাশ হয়ে যেতো।'

'বলো কি বাবা!' বিস্ময়-আতঙ্কে জুমানার চোখ স্থির হয়ে গেলো।

'একে তো রাতের অন্ধকার' সরদার সাজিদ সারহী আবার বলতে শুরু করলো, 'মশালের আলোয় কাছের জিনিসই তো আবছা দেখা যায়। দূরের জিনিস কুব কমই ঠাহর করা যায়। তারপর আবার আমার সাথী সঙ্গীরা লড়াইয়ে ব্যস্ত। কারো দিকে তো কারো কোন মনোযোগ থাকার কথা নয়। হঠাৎ আমার ওপর দুই স্পেনিশ আর্মি ঝাপিয়ে পড়লো। আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই মাথায় আঘাত করলো সম্ভবত রাইফেল দিলে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলাম। মনে হয়েছিলো মাথাটা যেন চৌচির হয়ে গেছে। সারা দুনিয়া ঘুরতে লাগলো। এ সময়ই সেখানে আয়মান উপস্থিত হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি আঘাত খেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর আয়মান আমাকে কিভাবে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, কি করে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছে, এর কিছুই মনে নেই।

... আহা ছেলেটাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিতে পারলাম না।'

'ধন্যবাদ তো আমিও দেইনি।' জুমানা বললো, 'ঘটনা আমাকে উনি বলার সময় তো উনার নামটি একবারও বলেননি। বাবা! সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে বাঁচানোর চেয়ে এভাবে নিজের কথা চেপে রাখার ব্যাপারটি আমার কাছে অনেক বেশি বিস্ময়কর লাগছে। এ ব্যাপারটি আকামে অভিভূত করেছে।'

'এ ধরনের ছেলেরা অন্যের বিপদে নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে সহজেই ঝাপিয়ে পড়ে। এটা যে কত বড় বীরত্বপূর্ণ ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সেটা আর ওরা মনে রাখে না। নয়তো এ কারণেই আমাকে বাঁচানোর ব্যাপারটি ওর কাছে মামুলি ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই র নামটিও তোমাকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি।'

'আরে তুমি এখন ক্যাম্পে কেন?' আবদুল করীম হুজ্জুল আয়মানকে ক্যাম্পে দেখে বললো। 'তোমাকে তো কাল পর্যন্ত বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে। গতকাল যারা নৈশ হামলায় ছিলো তাদের সবার জন্য একই ব্যবস্থা। যাও, তুমিও বিশ্রাম কারো গিয়ে।'

'না, মানে ওখানে ভালো লাগছিলো না। তাই ভাবলাম ক্যাম্পে এসে একটু ঘুরে যাই।'

'আরে এত দিন ভালো লাগলো আজ আবার কি হলো? ঠিক আছে ক্যাম্পেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। বিকালে সরদারে বাড়ি চলে যেয়ো। যতটা সম্ভব বিশ্রাম নিয়ে শরীর ঝরঝরে রাখতে হবে। হয়তো এমনও সময় আসবে যে, মুহূর্তের জন্য দু'চোখ এক করার সুযোগ পাবে না।'

আয়মান কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবদুল করীম অন্য সেনাদের দিকে মনোযোগ দিলো।

সরদারের বাড়িতে আয়মান সন্ধ্যার দিকে ফিরলো। সরদারের ঘরে জুমানা বসা ছিলো। আয়মানের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্য ঘরে চলে গেলো। আয়মান সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকলো।

'এখন কেমন আছেন সরদার?' আয়মান ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলো।

'এসো, বেটা! বসো এখানে।' সরদার শোয়া থেকে উঠে বসতে বসতে বললো, 'এখন বেশ ভালো আছি। দুপুরের দিকে মাথায় একটা চিনচিনে ব্যথা ছিলো। এখন সেটাও নেই। শুধু চাপ লাগলে ব্যথা করে। শরীরের দুর্বলতাও খুব একটা নেই। কালকের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতে পারবো। তা তুমি কি ক্যাম্পে গিয়েছিলে? তোমার না আজ বিশ্রামে থাকার কথা! না কি এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'না, শুয়ে বসে থাকতে কত ভালো লাগে? তাই ক্যাম্প থেকে ঘুরে এলাম। আর এখানে থাকতে অসুবিধা কি হবে? আপনাদের যত্ন ও আন্তরিকতায় বেশ সুখেই আছি। আরামে থাকতে থাকতে বরং শরীর ভারি হয়ে গেছে। একজন

সৈনিকের জীবনে এত আরাম আয়েশ থাকা ঠিক নয়। আর অনেক দিন থেকেই তো আপনার এখানে রইলাম। অনেক জ্বালাতন করেছি এতদিন। তবে আজীবন আপনাদের আতিথেয়তার কথা মনে থাকবে।'

'কারো কারো জ্বালাতন অনেক সময় মধুর চেয়ে ভালো লাগে। বুঝলে আয়মান! এমন মধুর জ্বালাতন আমরা সবসময় উপভোগ করতে চাই।' সরদার রহস্যময় কণ্ঠে বললো।

'মধুর জ্বালাতন? কথাটার মানে কি?'

'সব কথার মানে না বুঝলেও চলবে। ওহ, রাখো আমার একটা কাজ আচে। তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো। সময় হলে আমি তোমাকে ডাকবো। এখন যাও।'

আয়মান ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সরদার লোক মারফত গোত্রের কয়েকজনকে ডেকে বললো, 'আমাদের ক্যাম্পে চলে যাও। কমাণ্ডার আবদুল করীমকে সালাম জানিয়ে বলবে, আজ রাতে যদি উনি এখানে একটু সময় নিয়ে আসেন তাহলে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকবো।'

ওরা বেরিয়ে যেতেই সরদার তার মেয়ে জুমানাকে ডাকলো। জুমানা পাশের ঘরেই ছিলো এতক্ষণ।

'আয়মানের সঙ্গে এতক্ষণ যে কথাবার্তা হয়েছে তা তুমি নিশ্চয় শুনেছো।' সরদার বললো।

'হ্যাঁ বাবা! শুনেছি আমি। কিন্তু তুমি সেটা বুঝলে কি করে?' জুমানা বললো।

'আমি সেটা না বুঝলে এত বড় গোত্রের সরদার করি কি করে? এখন আমি কি করতে যাচ্ছি তুমি নিশ্চয় সেটা বুঝতে পারছো।' সরদার মেয়ের দিকে ঝুঁকে এসে বললো।

'হয়তো বুঝতে পারছি।'

'তোমার কি এতে ভিন্ন কোন মতামত আছে? কিংবা কোন আপত্তি?'

'বাবা! তুমি নিশ্চয় জানো তোমার মতামতই আমার মতামত। তবে আমার জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি কি এক তরফা এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছো? উনার সঙ্গে তো মনে হয় এ ব্যাপারে কোন আলাপ করোনি। যতটুকু শুনেছি উনি তো আমাদের এখানে থাকতেই অনীহা দেকাচ্ছিলেন।'

'শোন মা! আয়মানের এই অনীহাকেই আমি সম্মতি বলে ধরে নিচ্ছি। আর ওর সঙ্গে সরাসরি কতা না হলেও চোখে চোখে এবং মনে মনে কথা হয়ে গেছে।

আশা করি আমার ও তোমার উভয়ের ধারণার চেয়ে ওকে তুমি অনেক ভালো সঙ্গী হিসেবে পাবে।'

জুমানার মুখখানি লাল হয়ে উঠলো, চোখ দু'টো হয়ে উঠলো অশ্রুসিক্ত। আলতো করে ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠলো। কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না।

ঘন্টা তিনেক পরের ঘটনা। কমান্ডার আবদুল করীমসহ গোত্রের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে হজ্জুল আয়মান ও জুমানার মধ্যে বিয়ে পরিয়ে দেয়া হলো। সরদার সাজিদ সারহী এই বিয়ে হওয়াতে এত খুশি হলো যে, কেঁদে ফেললো। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো,

'তোমরা সবাই জানো, এ আমার আনন্দ-অশ্রু। আমার এই পার্থিব জীবনের সব চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু একটা চাওয়াই বাকি আছে। একটা স্বপ্নই অপূর্ণ রয়ে গেছে এখনো। সেটা হলো মারাকেশের স্বাধীনতা। আল্লাহ তাআলার কাছে আমার এখন একটাই প্রার্থনা, শহীদ ও গাজী মুক্তিসেনাদের জান বাজি লড়াইয়ের বিনিময়ে যেন মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীনতা দান করেন। এখন আর আমার কোন পিছুটান নেই। এখন আমি নিশ্চিন্তে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে পারবো।'

সবাই জয়ধ্বনি করে উঠলো। কেউ কেউ তকবীর ধ্বনিও দিলো।

'প্রিয় ইসলামের সৈনিকরা! মুক্তিকামী যোদ্ধারা!' আবদুল করীম দাঁড়িয়ে বললো, 'যেখানেই ইসলামের আবেদন পুর্ণাঙ্গভাবে চর্চার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই মুসলমানদের মধ্যে দান করা হয়েছে ঐক্যের শক্তি। আজ দেখো, আমরা লড়াইয়ের রক্তাক্ত ময়দানে থেকেও হাসতে পারি। 'যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও ভালোবাসা ও প্রেমের পরম সৌধ নির্মাণ করতে পারি আমরা। এই আয়মান ও জুমানার বিয়েটাও এরই জ্বলন্ত প্রমান'...।

'বন্ধুরা! মনে রেখো, আমাদের এ ঐক্য যদি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারি তাহলে আমরা ঐ বিজাতীয় দখলদারদের কবল থেকে একদিন না একদিন ইনশাআল্লাহ মারাকেশ স্বাধীন করতে পারবো। এটা ঠিক যে আমাদের সৈন্যবল, অস্ত্রবল সব কিছুই ওদের তুলনায় বলা যায় হাস্যকর। কিন্তু এক আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমান-বিশ্বাস বহুগুণ বেশি। এই প্রদীপ্ত বিশ্বাসের গৌরবই বিজয়ের মাল্য পরিয়ে একদিন আমাদেরকে গৌরাবান্বিত করবে। নারায়ে তাকবীর- আল্লাহু আকবার।'

সরদার সাজিদ সারহী ঘোষণা দিলেন, আগামীকাল দুপুরে এই গোত্রের সবার এবং সব মুক্তিসেনাদের ওলিমার দাওয়াত।

আয়মান ও জুমানা বাসর ররাতে যে অনাগত সন্তানের স্বপ্নবীজ রোপন করেছে, সে সন্তানকে তারা উৎসর্গ করলো মারাকেশের স্বাধীনতার নামে।

আবদুল করীম ও তার মুক্তিসেনাদের খ্যাতি এখন আর মারাকেশেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও আবদুল করীমের বীরত্বগাঁথা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি বৃটিশরা তাকে গোপনে অস্ত্র ও সনাসাহায্য দেয়ার প্রস্তাব করে। জার্মানিও একই ধরনের প্রস্তাব পেশ করে। ইউরোপের আরো কয়েকটা দেশ নানান ধরনের প্রলোভন দেখায়। কিন্তু আবদুল করীম এসবই কৌশলে প্রত্যাখ্যান করে।

কারণ, আবদুল করীম জানতো, এরা কেউ বন্ধু নয়। বন্ধুবেশে এরাও মারাকেশ দখল করতে চায়। তার একমাত্র নির্ভরতা ছিলো আল্লাহ তাআলা ও তার অমিত আত্মবিশ্বাসের ওপর মুক্তিসেনাদের মধ্যে এমন কিছু লোক পাওয়া গেলো, যারা প্রযুক্তি ও ইলেট্রিক্যাল বস্তুসামগ্রী বানাতে সিদ্ধহস্ত ছিলো। তারা শত্রুপক্ষের অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দেখে দেখে সেগুলো নিজেরা তৈরি করতে লাগলো। হাতবোমা, গ্রেনেড, শটগান, রাইফেল, এলএমজি, ক্লাশিনকোভ জাতীয় অস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম এই এক্সপার্টরা বানাতে শুরু করলো। এতে তাদের প্রাথমিক অস্ত্র স্বল্পতার সমস্যা কিছুটা লাঘব হলো। তবে মুক্তিসেনারা সেসব অস্ত্রই বেশি ব্যবহার করতো যেগুলো স্পেনিশদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতো। তারপরও আব্দুল করীম মুক্তিসেনাদেরকে সবসময় অস্ত্র তৈরিসহ বিভিন্ন শৈল্পিক কাজে উৎসাহ দিতো। আব্দুল করীম তাদেরকে বলতো,

'তোমরা অন্যের জিনিসের ওপর নির্ভর করে থেকো না। তোমাদেরকে যারা সাহায্য করবে তারা কোন না কোনভাবে এর চেয়ে দ্বিগুণ বিনিময় তোমাদের থেকে আদায় করে নেবে। হতে পারে, এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে তোমাদের স্বাধীনতার চেতনাই ছিনিয়ে নেবে। কিংবা ছিনিয়ে নেবে তোমাদের থেকে তোমাদের বুকে আগলে রাখা ঈমানের দীপ্তি।'

চৌদ্দ বছরের এক ছেলে তো মুক্তিসেনাদের দূরদূরান্তের ক্যাম্পগুলোর মধ্যে টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করে ফেললো। শত্রুদলের বিভিন্ন সেনা চৌকি ও ফৌজি কাফেরার ওপর হামলা করে করে মুক্তিসেনারা অনেক যুদ্ধ

সরঞ্জাম সংগ্রহ করে। এর মধ্যে অসংখ্য ক্যাবল টেলিফোন তার ও অসংখ্য টেলিফোন সেটও ছিলো।

মুক্তিসেনাদের জন্য এ জিনিসগুলো বেকার ছিলো। কারণ, তারা এর ব্যবহার জানতো না। কিন্তু চৌদ্দ বছরের এক ছেলে এগুলোকে মহামূল্যবান করে তুললো। সে টেলিফোন সিস্টেমের খুঁটিনাটি বিভিন্নভাবে শিখে নিলো। তারপর বহু কষ্ট করে ব্যাটারীরও ব্যবস্থা করলো। এরপর শক্তিশালী কিছু সৈনিকের সাহায্যে মাটির নিচ দিয়ে প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে টেলিফোন সিস্টেম চালু করে দিলো।

এতে আবদুল করীম ও তার জানবায দলের জন্য দারুন সুবিধা হয়ে গেলো। তারা জায়গায় বসে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পেয়ে যেতো। অনেক সময় বাঁচতো এবং দুশমনের ওপর হামলাগুলোও হতো দারুন সময়োপযোগী ও কঠোর। কিছু দিনের মধ্যে টেলিফোন সিষ্টেমকে এমন সক্রিয় করে তোলা হলো যে, যেখানেই প্রয়োজন হতো মুক্তিসেনারা সেখানেই টেলিফোন সিষ্টেম চালু করে নিতো।

মুক্তিসেনাদের হামলা, নৈশ হামলা ও গেরিলা হামলা এত ঘন ঘন ও তীব্রতর হয়ে উঠলো যে, শহর থেকে দূরের স্পেনিশ ফৌজের চৌকিগুলো সব খালি হয়ে গেলো। এসব চৌকির অধিকাংশ আর্মিই মারা গেলো। এই চৌকিগুলো শূন্য হওয়ায় স্পেনিশদের জন্য দূরদূরান্ত পর্যন্ত রসদ পৌছানো কঠিন হয়ে পড়লো। কারণ স্পেনিশদের রসদবাহী গাড়িগুলো মুক্তিসেনারা খুব সহজেই ছিনিয়ে নিতো।

এমনকি শহরগুলোতেও স্পেনিশ পৌজের পক্ষে টিকে তাকা মুশকিল হয়ে পড়লো। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক শহরের অধিকাংশ শহরবাসীই মুক্তিসেনাদের পক্ষে নেয়া শুরু করলো। অথচ এটা ছিলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থা নেয়া ও সরকারকে অসহযোগিতা করার মতো মারাত্মক অপরাধ। এই ঝুকি সত্ত্বেও শহরে লোকেরা স্পেনিশদের বিরুদ্ধে এবং মুক্তিসেনাদের পক্ষে কাজ করতে শুরু করলো।

সব জায়গাতেই স্পেনিশরা এমন কোনঠাসা হয়ে গেলো যে, স্পেনিশদের শাসন কার্যত খতম হয়ে গেলো। মুক্তি সেনাদের শাসন চলতে লাগলো স্পেনিশ অধ্যুষিত মারাকেশে। কাগজের খাতায় শুধু স্পেনিশদের শাসনকার্য ছিলো। যেটার দু'পয়সারও মূল্য ছিলো না। এটা ছিলো আসল মুক্তিসেনাদের সুস্পষ্ট বিজয়।

এখানে যত সহজে বলা হচ্ছে এ বিজয়ের কাহিনী এত সহজে রচিত হয়নি। হাজার হাজার মুক্তিসেনাদের শাহাদাতবরণ করতে হয়েছিলো।

অসংখ্য নৈশ গেরিলা হামলা চালানো হয়েছিলো। এর প্রতিটি হামলায় একাধিক মুক্তিসেনা শহীদ হয়েছে। আহত হয়েছে অনেক। এর মধ্যে কারো

কারো এক বা একাধিক অঙ্গহানিও ঘটেছে। মুক্তিসেনাদের মধ্যে কমবয়সী ছেলে-মেয়েও ছিলো। এদের মধ্যে যারা শত্রুদলের হাতে ধরা পড়তো তাদের এমন পৈশাচিক কায়দায় শাস্তি দেয়া হতো যে, তা দেখে অনেক স্পেনিশ সৈনিক আর্মি ছেড়ে চলে গেছে, না হয় নিজেদের ধর্মত্যাগী হয়েগেছে।

এসব ছেলে-মেয়ের পরিবারের লোকদেরকেও ক্ষমা করা হতো না। ঘরের নারী শিশুদেরকেও প্রহার করা হতো, অপদস্থ করা হতো। আর যুবতী মেয়ে থাকলে তো ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেতো, তাদের দেহের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ঝড়িয়ে ঝড়িয়ে ওদেরকে মারা হতো।

মারাকেশের বালুকণা মুক্তিসেনা ও তাদের পরিবার-আপনজনদের রক্তে কর্দমাক্ত হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্পেনিশ ফৌজের হাড়গোড়ও মরুভূমিতে স্তুপিকৃত হতে থাকে।

মারাকেশ এভাবে তার বন্ধু ও শত্রুদের রক্তে ডুবে যায়। এভাবে স্পেনিশদের দখলকৃত মারাকেশের পরাধীন এলাকাগুলো স্বাধীন হওয়ার পূর্ণাঙ্গ পথে রূপান্তরিত হয়। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার বাকি।

দীর্ঘ গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত হওয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন। এসময় আবদুল করীম রণাঙ্গনীয় এক কৌশলগত ভুল করেন। ঐতিহাসিকদের মতে এ সময় তার উচিত ছিলো, স্পেনিশ অধ্যুষিত এলাকা ও শহরগুলোতে নিজেদের পূর্ণাঙ্গ দখলদারিত্ব নিশ্চিত করা। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং সুশৃঙ্খল সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের বিজিত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া। এরই ভিত্তিতে গড়ে উঠতো নিজেদের স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা, স্বাধীন রাষ্ট্র এবং মুক্ত ও স্বাধীন নাগরিক সত্ত্বা।

স্পেনিশদের পিছু হটিয়ে এবং নিজেদের বিজয় সুনিশ্চিত হওয়ায় আবদুল করী ও তার সেনাদের মনোবল এতই বেড়ে গেলো যে, কিছু বাস্তবতা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো। তাদের জযবা নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়লো। তারা এবার ফ্রান্সীয় ফৌজের ওপর হামলা শুরু করলো।

ফ্রান্সীয়দের ওমর হামলার ব্যাপারে নৈশ ও গেরিলা হামলার কৌশলও অবলম্বন করলো। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে স্পেনিশদের বিরুদ্ধে এরা সফল হয়েছে দারুনভাবে। কিন্তু ফ্রান্সীয়রা স্পেনিশদের এই পরিমাণ দেখে আগ থেকেই ভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। তাদের তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক

শক্তিশারী করে রাখে। জবাবী হামলার ব্যবস্থাও করে রাখে। এছাড়াও ফ্রান্সীয়রা সৈন্যবল ও অস্ত্রবলে স্পেনিশদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশারী ছিলো। মারাকেশের দখলকৃত এলাকাও ছিলো বেশি।

এর বিপরীতে মুক্তিসেনাদের সংখ্যা যেমন ছিলো কম, অস্ত্রশস্ত্র ছিলো আরো কম এবং উপায়-উপকরণও ছিলো সীমিত।

এত কিছুর পরও মুক্তিসেনাদের গেরিলা অপারেশন এতই সফল হলো যে, ফ্রান্সীয়রা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলো। কারণ, ওরা যতই প্রস্তুতি নিয়ে রাখুক গেরিলা হামলায় তো এরা অভিজ্ঞ ছিলো না মোটেও। আর মুক্তিসেনারা প্রত্যেকেই চিলো গেরিলা অপারেশনের বিশেষজ্ঞ। দেখা গেলো, এই গেরিলা অপারেশনের কারণে ফ্রান্সীয়দের হাত থেকে অনেকগুলো চৌকি ছুটে গেছে।

কোথাও কোথাও তো ফ্রান্সীয় আর্মির সঙ্গে মুক্তিসেনাদের মুখোমুখি সংঘর্ষও হয়েছে। কিন্তু সেসব জায়গায় মুক্তিসেনাদের চরম আক্রোশ ও তীব্র হামলার সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

ফ্রান্সীয়দের জেনারেল এখন লাইটে। লাইটে অতি চতুর জেনারেল ছিলেন। জেনারেল লাইটে মুক্তিসেনাদের বিরুদ্ধে মারাকেশের সেসব গোত্র সরদারদের ব্যবহার করতে চাইলো, যাদেরকে বহু টাকা-পয়সা, জায়গীর ও সুন্দরী নারীদেরকে দিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলো। জেনারেল লাইটে চাচ্ছিলেন এই সময় গোত্রগুলো যেন মুক্তিসেনাদের পক্ষে কাজ না করে।

এক সরদার তার গোত্রের সবাইকে বলে দিলো, তারা যেন ফ্রান্সীয়দের সঙ্গ দেয়। তাদের পক্ষে কাজ করে। কারণ মুক্তিসেনা নামের ঐ মুসলমানগুলো ডাকাত, ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী। পরদিনই সেই সরদারের লাশ এমন বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো যে, তার দুই পা, দুই হাত ও মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক পড়ে ছিলো। আর সেগুলো কাড়াকাড়ি করছিলো শৃগাল, কুকুর।

অন্যসব সরদারকে কালো খামে করে এই পয়গাম দিলো,

‘ তোমরা নিশ্চয় তোমাদের এক সঙ্গীর পরিণাম দেখেছো। মনে রেখো, তার দেহ থেকে তার পা দুটি ও বাহু দুটি তখনই কেটে পৃথক করা হয়েছিলো যখন সে জীবিত ছিলো আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে তার মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যে এটা উপভোগ করতে চাও, সে সাহস করে একবার মুক্তিসেনাদের বিরুদ্ধে বলেই দেখো না।’

এরপর আর কোন সরদার ফ্রান্সীয়দের সঙ্গ দিতেও কাউকে বলেনি এবং মুক্তিসেনাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি। এমনকি গোপনেও নয়।

ফ্রান্সীয়রা যখন দেখলো তাদের এ কৌশলও ব্যর্থ হয়েছে, তখন তারা স্পেনিশদের কাছে এ প্রস্তাব পাঠালো, মারাকেশের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এবং বিদ্রোহী মুক্তিসেনাদের উৎখাত করার এখন একমাত্র উপায় হলো, ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। সম্মিলিতভাবে তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়া।

স্পেন নিজেদের চরম পরাজয় থেকে বাঁচানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব লুফে নিলো। এর আগে কিন্তু ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে মিত্র সম্পর্ক ছিলো না। তাদের মধ্যে শীতল সম্পর্ক ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে এ দুই দখলদার দেশ সম্মিলিত কার্যক্রম শুরু করে দিলো।

ওদিকে ফ্রান্স জেনারেল লাইটেক কমান্ডিং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে মার্শাল পেটীনকে মারাকেশ পাঠালো। বৃদ্ধ মার্শাল পেটীন ছিলেন সর্বস্বীকৃত যুদ্ধগুরু। তার মতো এমন অভিজ্ঞ, তীক্ষ্মধারী কমান্ডার ফ্রান্স ও স্পেনে একজনও ছিলোনা। স্পেনও আরেক মার্শাল পাঠালো মারাকেশে। তার নাম মার্শাল প্রেমোদী রিভার। ইনিও ছিলেন অতি দক্ষ যুদ্ধবাজ নেতা।

এরা উভয়ে উভয়ের বাহিনীকে এক ছাউনিতে নিয়ে এলো। সম্মিলিত হাইকমান্ড হিসেবে তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলা হলো। দু'দেশই আরো অধিক সংখ্যক সেনা পাঠিয়ে দিলো। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স তো যুদ্ধ বিমানও পাঠিয়ে দিলো মারাকেশে। আর পাঠালো বিমাল কামান বহর। যুদ্ধ বিমান ও কামানবহর মুক্তি সেনাদের জন্য ভয়ংকর অস্ত্র ছিলো।

তবে মুক্তিসেনারাও শত্রুর সেনাবিন্যাস অনুযায়ী নিজেদের সেনাবিন্যাস বদলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে খোলা যুদ্ধেরও প্রস্তুতি নিয়ে রাখলো। ওদিকে গেরিলা ও কমান্ডো অপারেশনও অব্যাহ রাখলো। এই গেরিলা ও কমান্ডো অপারেশন চালিয়ে মুক্তিসেনারা ফ্রান্সীয়দের রসদ সরবরাহের পথগুলো বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো। দূরদূরান্তের চৌকি পর্যন্ত রসদ পৌছতে দিতো না মুক্তিরা।

শত্রুরা এবার রসদবহরের সঙ্গে আর্মি ইউনিটও পাঠাতে শুরু করলো। মুক্তিসেনারা তাদের ওপরও হামলা করে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে শত্রু সেনাদের বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো। কিন্তু ফ্রান্সীয়রা যখন রসদের বহরের সঙ্গে যুদ্ধ বিমানও পাঠাতে শুরু করলো, তখন

তো মুক্তিসেনাদের জন্য টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়লো। মরুর খোলা আকাশের নিচে বিমান হামলা থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। এভাবে শত্রুদল রসদ সরবরাহের পথ নিশ্ছিদ্র করে নিলো।

আবদুল করীম এবার নিজেদের হামলার ধরণ পাল্টে ফেললেন। মারাকেশে ছেষট্টিটি দুর্গ ছিলো। অনেক দুর্গ ফ্রান্সীয়রাও নির্মাণ করে। এসব দূর্গগুলো ছোট ও মাঝারি ধরনের ছিলো। শত্রুদল এগুলোকে প্রতিরক্ষা ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলো। আর মুক্তিসেনারা এসব দূর্গের ওপর হামলা করতে শুরু করলো।

১৯২৪ সনের শেষের দিকে মুক্তিসেনারা নয়টি কেল্লা ফ্রান্সীয় ও স্পেনিশদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বড় সংকট যেটা দেখা দিলো সেটা হলো, আবদুল করীমের সেনাসংখ্যা ক্রমেই কমে যেতে লাগলো। অস্ত্র ও গোলাবারুদের স্বল্পতাও অনুভূত হতে লাগলো। কারণ তাদের কাছে তো অস্ত্র তৈরির কোন ফ্যাক্টরী ছিলো না। অস্ত্র সরবরাহের মতো তাদের কোন মিত্র দেশও ছিলো না।

ফ্রান্সীয়রা শহর, উপশহর এমনকি গ্রাম পর্যন্ত গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলো। কারো ওপর যদি সামান্য সন্দেহ হতো সে মুক্তিসেনাদের কোনধরনের সহযোগিতা করেছে, তাহলে তার পুরো গোষ্ঠিকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালানো হতো। ফ্রান্সীয়দের কোন দূর্গ যদি মুক্তিসেনাদের হাতে বিজিত হতো, তাহলে অন্যান্য শহরের মারাকেশী মুসলমানদের বহু ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিতো ফ্রান্সীয়রা।

তারপরও মুক্তিসেনাদের মনোবল ভাঙ্গেনি। তাদের সেনা ও অস্ত্র স্বল্পতাকে পূরণ করতো ঈমানদীপ্ত জযবা ও সংকল্প দ্বারা।

এর মধ্যে আবদুল করীম মানবতার আরেক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সেটা হলো, মুক্তিসেনাদের হাতে অনেক স্পেনিশ ও ফ্রান্সীয় সৈন্য বন্দি ছিলো। এরা যুদ্ধবন্দি। যুদ্ধবন্ধিদের সঙ্গে সব শত্রুপক্ষই চরম অমানবিক আচরণ করে। চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে তাদেরকে নিকৃষ্টতর মনে করা হয়। যুদ্ধবন্দিকে সসম্মানে মুক্তি দেয়াতো দূরের কথা। কিন্তু আবদুল করীমের নির্দেশে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করা হতো। ১৯২৫ সনে আবদুল করীম সব যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দেন। শুধু তাই না, নৌযানের ব্যবস্থা করে তাদেরকে সমুদ্র পার করে দেয়া হয়।

এদের মধ্যে কিছু কয়েদী তো মুসলমানদের ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হলো যে, নিজেদের দেশে না ফিরে মুক্তিসেনাদের দলে যোগ দিলো এবং তাদের কাঁধে

কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পরলো১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত হাই কমাণ্ড মুক্তিসেনাদের ওপর চূড়ান্ত হামলা করলো। এতে পুরো কামানবহর ও সবগুলো যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের ইতিহাসে একে এক অমানবিক ও পৈশাচিক হামলা বলে আখ্যায়িত করা হয়। মুক্তিসেনাদের প্রতিটি মোর্চা ও ক্যাম্পগুলোতে যুদ্ধবিমান থেকে অনবতর বোমাবর্ষণ করা হয়।

জনবসতির কোথাও সামান্য সন্দেহ হলেই পুরো বসতিই বোমার আঘাতে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও হাজার হাজার সশস্ত্র ঘোড়সাওয়ার এই হামলায় অংশগ্রহণ করে। তারপরও মুক্তিসেনারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে লড়াই করতে চেষ্টা করলো। শত্রুদলকেও ছোট ছোট দলে বিক্ষিপ্ত করার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে গেলো। কিন্তু শত্রুসেনা তাদের বিন্যাস সারির মোটেও রদবদল করলোনা।

গোলাগুলি ও অবিরাম বোমাবর্ষণ অব্যহত রাখলো। তাদের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী, পশু-পাখি এমনকি গাছপালাও বাদ গেলোনা। ব্যবসায়ীদের শত শত কাফেলা বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেলো। কোন নিরপরাধকেও তারা ছাড়লো না। মুক্তিসেনাদের সংখ্যা খুব দ্রুত কমে যেতে লাগলো। ইমোনেশনও খতম হয়ে গেলো। তারপর তারা তলোয়ার ও বর্শার সাহায্যে লড়তে লাগলো। কিন্তু এই আগুন ও রক্ত ঝড়ের সামনে তারা খড়কুটার মতো উড়ে গেলো।

মুক্তিসেনারা তো নিজেদের প্রাণ নিজেদের হাতে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু শত্রুদল নর পিছাচের মতো এর শাস্তি দিচ্ছিলো নিরপরাধ শহরবাসীকে। তাদেরকে পাইকারি দরে হত্যা করা হচ্ছিলো। হত্যা করা হচ্ছিলো নারী ও শিশুদেরকেও। পরাজয় দেখা যাচ্ছিলো স্পষ্ট। কোথাও থেকে তো সাহায্যেল আশাই ছিলো না। আবদুল করীম সাধারণ মানুষকে নরপিশাচদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধবন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি শত্রু শিবিরে সাদা ঝাণ্ডাসহ এক লোককে পাঠালেন দূর হিসাবে। কিন্তু শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানালো।

আবদুল করীমের সঙ্গে তখন খুব সামান্যই মুক্তিসেনারা রয়ে গিয়েছিলো। তাও প্রায় নিরস্ত্র। অবশেষে আবদুল করীম ১৯২৬ সনের এপ্রিয়ে এই ঘোষণা দিলেন,

'মারাকেশের রক্ত একমাত্র আমার কারণেই ঝড়ছে। আর রক্ত ঝড়ছে তাদের, যারা লড়তে জানে না। আর যারা লড়তে পারতো তারা লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে

গেছে। তবে ইনশাআল্লাহ মারাকেশ একদিন অবশ্যই স্বাধীন হবে। সেটা খুব শিগগীরই হবে। আমি রণাঙ্গনে না থাকলেও এখন অনেক আবদুল করীম সূর্যোদয়ের মতো জেগে উঠবে। ওই রক্ত সাগরের ভেতরেই আমার পরের আবদুল করীমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে। তারা যেদিন উঠে দাঁড়াবে, সেদিন আর ঐ জালিম-সন্ত্রাসী সাম্রাজ্যবাদীরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।'

এই ঘোষণা দিয়ে তিনি ফ্রান্স ও স্পেনিশদের হেডকোয়ার্টারের দিকে হাঁটা ধরলেন। তিনি যখন সেখানে পৌছলেন, তখন তার মুখে এক চিলতে হাসি লেগেছিলো। তাঁকে দেখে ফ্রান্সের মার্শাল পেটীন ও স্পেনের মার্শাল প্রেমোদি রিভার একসঙ্গে সম্ভ্রমে স্যালুট করলেন এবং পরমুহূর্তেই তাকে গ্রেফতার করা হলো। এরপর তাকে তার পরিবারসহ রীইউনীন দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হলো।

তাঁকে নির্বাসনে পাঠানোর পরও স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন থেমে যায়নি। মাত্র তিনমাসের মাথায় ওরা আবার সুসংগঠিত হতে শুরু করলো। তারপর ১৯৫৬ সনের ৬ মার্চ মারাকেশ পূর্ণাঙ্গরূপে স্বাধীন হলো। আবদুল করীম যেদিন স্বাধীন মারাকেশে পা রাখলেন, সেদিনই মারাকেশবাসী স্বাধীনতা ও বিজয়লাভের আনন্দ উদযাপন করলো।

সেদিন সবার আনন্দ উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন আবদুল করীম।

লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জনারণ্যে তিনি যেন এক দীঘল বৃক্ষ।

এর পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায়, কাণ্ডে-শিকড়ে আদিগন্ত প্রসারিত ছায়াবীথিতে আজো উচ্চকিত হচ্ছে স্বাধীনতার অজর মন্ত্র-শ্লোগান।

**সমাপ্ত**

প্রেম যুদ্ধ
এনায়েতুল্লাহ আলতামাস
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
design : najmul haider shaj creation